বাছাই সেরা গল্প

সুকুমার রায়

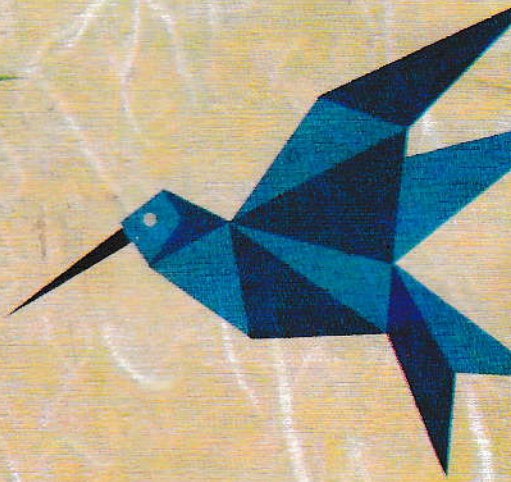

বাছাই সেরা গল্প

বাছাই সেরা গল্প

সুকুমার রায়

বইপড়া ॥ ঢাকা

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
সালমা বেগম
বইপড়া
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (তৃতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
প্রকাশক

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
মাহবুব কামরান

মুদ্রণ
জে.এম. প্রিন্টার্স

দাম
১৭৫ টাকা

ISBN : 984 70083 0064 4

Bashai Sera Galpa by Shukumar Roi. Published by Salma Begum of Boipora 38/4 Mannan Market 2nd Floor Banglabazar, Dhaka 1100. Secound Published February 2016. Price : Taka 175.00 only

সূ চি প ত্র

হযবরল ॥ ৭
পাগলা দাশু ॥ ২৮
দাশুর খ্যাপামি ॥ ৩৩
চীনেপট্‌কা ॥ ৩৭
দাশুর কীর্তি ॥ ৪০
চালিয়াৎ ॥ ৪৩
সবজান্তা ॥ ৪৬
ভোলানাথের সর্দারি ॥ ৫০
আশ্চর্য কবিতা ॥ ৫৪
নন্দলালের মন্দ কপাল ॥ ৫৮
নতুন পণ্ডিত ॥ ৬১
সবজান্তা দাদা ॥ ৬৪
যতীনের জুতো ॥ ৬৬
ডিটেক্‌টিভ ॥ ৭০
ব্যোমকেশের মাঞ্জা ॥ ৭৪
জগ্যিদাসের মামা ॥ ৭৮
আজব সাজা ॥ ৮০
কালাচাঁদের ছবি ॥ ৮২
গোপালের পড়া ॥ ৮৫
পেটুক ॥ ৮৭
ভুল গল্প ॥ ৯০
গল্প ॥ ৯৭
দ্রিঘাংচু ॥ ১০০
এক বছরের রাজা ॥ ১০৪
হিংসুটি ॥ ১০৭
দুই বন্ধু ॥ ১০৯
গরুর বুদ্ধি ॥ ১১২
ছাতার মালিক ॥ ১১৪
অসিলক্ষণ পণ্ডিত ॥ ১১৮
ব্যাঙের রাজা ॥ ১২০
ডাকাত নাকি? ॥ ১২৪

হযবরল

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাঁও!' কি আপদ! রুমালটা ম্যাঁও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটাসোটা লাল টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটি বেড়াল।'

অমনি বেড়ালটা বিলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।'

বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।' আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?'

শুনে বেড়ালটা 'তাও জানো না? ব'লে এক চোখ বুজে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে

তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?'

বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?'

আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জানো?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানিনে? কলকেতা, ডায়মণ্ড হারবার, রানাঘাট, তিব্বত,—বাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।'

আমি বললাম, 'তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?'

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছো দাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?'

বেড়াল বলল, ' গেছো দাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।'

আমি বললাম, 'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

বেড়াল খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই।'

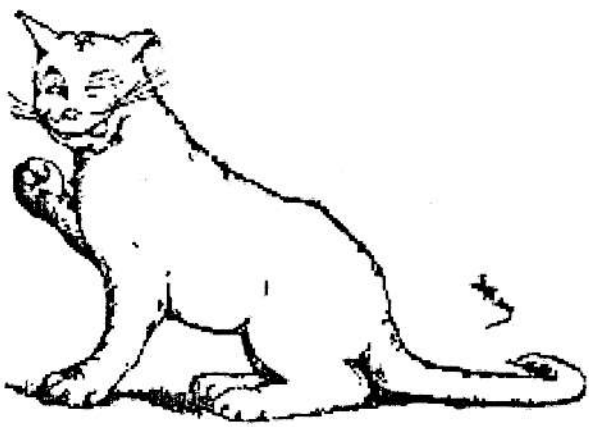

আমি বললাম, 'কি রকম?'

বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেলেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?'

বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি', বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দূর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছ, একটুও ভালো লাগে না।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।' আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয়?'

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট-পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চৌদ্দ।'

কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি, ফেল্।'

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।'

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চৌদ্দ হয় না? এখন কেন?'

কাক বলল, 'তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চৌদ্দ হয়নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চৌদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চৌদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

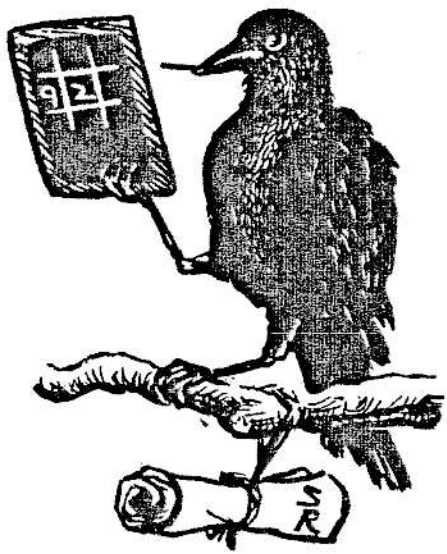

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চৌদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চৌদ্দ। এক ঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?'

আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?'

কাক বলল, 'এখানে ক'দিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এই তো ক'দিন আগে খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটা সময়

জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো, তাতে কল্‌কে-টল্‌কে কিচ্ছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কই, হিসেবটা হল?'

কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।'

বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?' কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিন বললে?'

বুড়ো বলল, 'উনিশ।'

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।'

বুড়ো বলল, 'একুশ।' কাক বলল, 'বাইশ।' বুড়ো বলল, 'তেইশ।' কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ।' ঠিক যেন নিলেম ডাকছে। ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে?' আমি বললাম, 'খামখা ডাকতে যাব কেন?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্ বন্ করে আট-দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরানো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?'

বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।' দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'ওজন কত?'

আমি বললাম, 'জানি না।' বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে টিপে বলল, 'আড়াই সের।' আমি বললাম, 'সে কি, পট্‌লার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।' কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমার হিসেব অন্য রকম।'

বুড়ো বলল, 'তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দুৎ! আমার বয়েস হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়তি না কমতি?' আমি বললাম, 'সে আবার কি?'

বুড়ো বলল, 'বলি, বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?' আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?' বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না?' বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ হয় না—ঊনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চট্‌পট্ সেরে নি।'

বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, 'একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

'তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ-রৈ-রৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষিরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুড়সুড় করে পালাতে লাগল।'

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?'

আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?' বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

আমি বললাম, 'সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।'

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল, তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ্! ফের যদি টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।' কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'টেকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে বসে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, 'হিসেবটা দেখবে নাকি?' বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে? কই দেখি।' কাক অমনি 'এই দেখ' বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস্‌ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে 'ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা' বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি! ষাট ষাট।' বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, 'একষট্টি, বাষট্টি— কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।'

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না?'

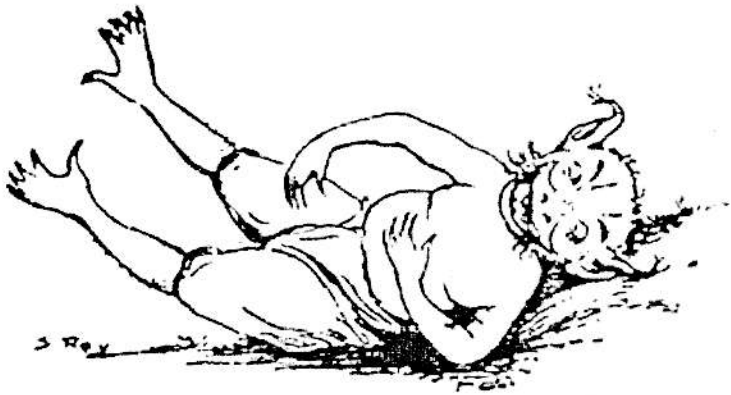

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো! কি হিসেব হল পড় দেখি।' আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম, খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এসব কি লিখেছ আবোল-তাবোল? কাক বলল, 'ওসব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকসমতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।' বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না?' কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও বলা হয়েছে। ওহে, শেষ দিকটা পড় তো?'

আমি দেখলাম, শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—'

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা/২॥ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্-সি-এম্‌ও নয়, জি-সি-এম্‌ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম, আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তাহলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিগ্‌গেস করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো! বুধো রে!'

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস?' বুড়ো বলল, 'কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।'

আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে?' বুড়ো বলল, 'বলছে ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ?' তেড়ে উত্তর হল, 'কাকে বলছে ভগ্নাংশ? তোকে না আমাকে? বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক?'

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা ত্রৈরাশিক দিতে বল।'

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর তুমি ভগ্নাংশই দাও।' কাক বলল, 'তাহলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে—খাঁটি হলে দু টাকা চৌদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।'

বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছ'টা।' পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি! সে 'টাক্-ডুমাডুম্, টাক্-ডুমাডুম্' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক্ টাক্ বলছিস? দাঁড়া। ওরে বুধো, বুধো রে! শিগগির আয়। আবার টাক্ বলছে।' বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে

তুলবে, না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, 'ওঠ্ বলছি, শিগগির ওঠ্' ব'লে ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল। কাক আমার দিকে চোখ মট্‌কিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁট্‌লাসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্‌টুপিড উঠো!' উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!'

কাক বলল, 'লেগে যা—নারদ-নারদ!'

অমনি ঝটাপট্, খটাপট্, দমাদম্, ধপাধপ্! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছট্‌ফট্ করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?' উধো কাঁদতে লাগল, 'ওরে হায় হায়! আমাদের কি হল রে!' তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কি রকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, 'এই গেল গেল—নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!'

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।'

আমি বললাম, 'তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?'

জন্তুটা বলল, 'কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্ প্যাচে কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ্ আছাড় খেয়ে পড়ত, তাহলে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ— এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?'

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, 'না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ, আর এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা—' আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, 'কেন তুমি এই সব অসম্ভব কথা ভেবে খামকা হেসে হেসে কষ্ট পাচ্ছ?' সে বলল, 'না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কে? তোমার নাম কি?' সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌। আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার ভায়ের নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার বাবার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার পিসের নাম হিজিবিজ্‌বিজ'— আমি বললাম 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজিবিজ্‌বিজ্‌।'

সে আবার খানিক ভেবে বলল, 'তা তো নয়, আমার মামার নাম তকাই। আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'সত্যি বলছ? না, বানিয়ে?' জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'না না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।' আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, 'একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না বলতেই সে তড়তড় করে বলে যেতে লাগল, 'তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—'ছাগলে কি না খায়।' এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাদ্য বিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরেজিতে লিখবার সময়

লিখি B.A. অর্থাৎ ব্যা। কোন্-কোন্ জিনিস খাওয়া যায় আর কোন্টা-কোন্টা খাওয়া যায় না, তা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল—পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়—এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা এক্কেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবিশ্যি আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেসের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কক্ষণো খাই না। আমরা ক্বচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোশক বালিশ এসব একটু আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিম্বা চেখে দেখি,—যেমন, পেনসিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ সব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে সব নেহাৎ ছোটখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একবার একটা আস্ত বার্-সোপ খেয়ে ফেলেছিল—বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে। হিজিবিজ্বিজ্টা এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ-মাঁউ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির! আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার! কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে লেগেছে।'

আমি বললাম, 'এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?' সে বলল, 'সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাত যে, সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম্ মারতে লেগেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—'

আমি বললাম, 'যত সব বাজে কথা।' এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়া মাথা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে

আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আব্দার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগল, 'না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বল না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।' আমি বললাম, 'কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?'

লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল, 'রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?'

আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজিবিজ্‌বিজ্‌টা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।' অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুন্‌গুন্ করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল—'লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।' ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দু'বার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল।

আমি বললাম, 'এ তো ভারি উৎপাত দেখছি, গানের কি আর কোনো পদ নেই?'

নেড়া বলল, 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম। সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে—নাইনিতালের নতুন আলু—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।' এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলোভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে
সরু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, 'এ আবার গান হল নাকি। এর তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয় না।'

হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'হ্যাঁ, গানটা ভারি শক্ত।'

ছাগল বলল, 'শক্ত আবার কোথায়? ঐ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তাছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না।'

নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, 'তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?' এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আমি বললাম, 'মজারু বলে কোনো কথা হয় না।' নেড়া বলল, 'কেন হবে না—আলবৎ হয়। সজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না?'

ছাগল বলল, 'ততক্ষণ গানটা চলুক না, হয় কি না-হয় পরে দেখা যাবে।' অমনি আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—

সজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নী আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানী,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।
বাদুড় বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নী তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।

গানটা আরও চলত কি-না জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শাম্‌লাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ থাব্‌ড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, 'কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।' হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলা ব্যাং রুল উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—'মানহানির মোকদ্দমা।'

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্‌লা-পরা হুতোম প্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

প্যাঁচা একবার ঘোলা ঘোলা চোখ করে চারদিকে তাকিয়েই তক্ষণি আবার চোখ বুজে বলল, 'নালিশ বাতলাও।'

বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিম্‌চিয়ে পাঁচ-ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, 'ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু ইত্যাদি। কচু গাছের মূলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টা একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।'

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শ্যামলা মাথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষে চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক থুঃ।' সজারুটা আবার ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাব্‌ড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'দলিলপত্র সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?' সজারু ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।' বলতেই কুমিরটা ন্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই
চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই
গোলাপ চাঁপা জুঁই
ইলিশ মাগুর রুই
হিন্‌চে পালং পুঁই
সান্ বাঁধানো ভুঁই
গোবরজলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

সজারু বলল, 'আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।' কুমির বলল, 'তাই নাকি? আচ্ছা, দাঁড়াও।' এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনি রাতের পেতনীপিসি সজনেতলায় খোঁজ্ না রে—
থ্যাঁৎলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ্ ভোজ মারে।
চাল্‌তা গাছে আল্‌তা পরা নাক ঝোলানো শাঁখচুনি
মাক্‌ড়ি নেড়ে হাঁক্‌ড়ে বলে, আমায় তো কেঁউ ডাঁকছনি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিন্‌সেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।

সজারু বলল, 'দূর ছাই! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক।'

কুমির বলল, 'তাহলে কোন্‌টা, এইটা!—দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল—এটাও নয়? আচ্ছা তাহলে দাঁড়াও দেখছি—নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে, খালিখালি খিদে পায় কেন রে?—কি বললে? ওসব নয়? তোমার গিন্নীর নামে কবিতা?—তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো—রাম ভজনের গিন্নীটা, বাপরে, যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্‌ঝন্, কাপড় কাচে দমাদ্দম্—এটাও মিলছে না? তাহলে নিশ্চয়ই এটা—

খুস্‌খুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, *ফুস্‌ফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্।*
মাজ্‌রাতে ব্যথা পাঁজরাতে বাত, *আজ রাতে বুড়ো হবে কুপোকাৎ!*

সজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, 'হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!'

ন্যাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়েছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কোনটা শুনতে চাও? সেই যে—বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু—সেইটে?' সজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।

অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, 'বাদুড় কি বলে? হুজুর, তাহলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।'

কোলা ব্যাঙ গাল গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, 'বাদুড়গোপাল হাজির?'

সবাই এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, 'তাহলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।' কুমির বলল, 'তা কেন? এখন আমরা আপিল করব?'

প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, 'আপিল চলুক। সাক্ষী আনো।'

কুমির এদিক-ওদিক তাকিয়ে হিজিবিজ্‌বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, 'সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।' পয়সার নামে হিজিবিজ্‌বিজ্ তড়াক্ করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হেসে ফেলল।

শেয়াল বলল, 'হাসছ কেন?' হিজিবিজ্‌বিজ্ বলল, 'একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ— হোঃ হোঃ হোঃ হো—

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সজারুকে চেন?' হিজিবিজ্‌বিজ্ বলল, 'হ্যাঁ, সজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। সজারু গর্তে থাকে, আর গায়ে লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা চাকা টিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।' বলতেই ব্যাকরণ শিং ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, 'আবার কি হল?' ছাগল বলল, 'আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।' আমি বললাম, 'গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।'

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মোকদ্দমার কিছু জান?' হিজিবিজ্‌বিজ্ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল তাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়।'

প্যাঁচা বলল, 'কক্ষণো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।'

হিজিবিজ্‌বিজ্ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।' বলেই সে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, 'আবার কি হল?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—'

শেয়াল বলল, 'বটে? তোমার নাম কি শুনি?' সে বলল, 'এখন আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌।'

শেয়াল বলল, 'নামের আবার এখন-তখন কি? হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে আলু-নারকোল, আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।'

শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।' অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উদো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।' উদো বলল, 'দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস্‌ হুস্‌ করে মরে যায়।' বুধো বলল, 'হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।'

শেয়াল বলল, 'আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারি গোলমাল হয়।' শুনে উদো বুধোকে বলল, 'ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে মারতে সাবাড় করে ফেলব।' বুধো বলল, 'আবার যদি গোলমাল করিস তাহলে তোকে ধরে এক্কেবারে পোঁট্‌লা-পেটা করে দেব।'

শেয়াল বলল, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।' শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।' বলেই সে তক্ষুনি ঠক্‌ঠক্‌ করে ষোলটা পয়সা গুনে হিজবিজ্‌বিজ্‌ের হাতে দিয়ে দিল। অমনি কে যেন উপর থেকে বলে উঠল '১ নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।' চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে বসে হিসাব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো না?' হিজবিজ্‌বিজ্‌ খানিক ভেবে বলল, 'শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।'

শেয়াল বলল, 'কি গান শুনি, হিজিবিজ্‌বিজ্‌ সুর করে বলতে লাগল, 'আয় আয়, আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়—

বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'থাক্ থাক্, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।'

এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ্ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, 'শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে, ৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য—'

শেয়াল বলল, 'বাজে কথা বল না, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?'

কাক বলল, 'কি আপদ! তাই তো বলছিলাম—শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে।' শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?' কাক বলল, 'বললাম যে কাগেয়াপটি।'

শেয়াল বলল, 'সে এখান থেকে কতদূর?' কাক বলল, 'তা বলা ভারি শক্ত। ঘণ্টা হিসাবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দু' পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।'

শেয়াল বলল, 'আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?' কাক বলল, 'তা আর চিনিনে? এই তো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।' শেয়াল বলল, 'এ-পথ কতদূর গিয়েছে?' কাক বলল, 'পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক-ওদিক চলে বেড়ায়? না দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?'

শেয়াল বলল, 'তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জান?'

কাক বলল, 'খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে বসে হিসাব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চার প্রকার—হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্ করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তারপর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল—তাকে বলে

কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল, সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলতো তেলচোরা, কুমিরকে বলতো অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলতো বিভীষণ—

বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে টপ্ করে কোলা ব্যাংকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্‌কিচ্ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস্ হুস্ করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল।

প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' এই বলেই সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও, মানহানির মকদ্দমা, ২৪ নম্বর। ফরিয়াদী—সজারু। আসামী—দাঁড়াও। আসামী কৈ?' তখন সবাই বলল, 'ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।' তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হল—ন্যাড়ার তিন মাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, 'ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে?'

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যা করে ডেকে উঠল।

আমি বড়মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়মামা বললেন, 'যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।' মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া ফেলে। সেবার এক নতুন দারোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই আন্দাজে ঠিক করিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চাল-চলনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে। তাহার চোখ দুটি গোল গোল, কান দুটি অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁক্‌ড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

'দাশু' অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের ইস্কুলে ভরতি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের 'ক্লাশের ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু তাহাকে খামখা দু'কথা শুনাইয়া

বলিল, "আমার বুঝি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, "তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক!" জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি ধমক দিয়া দিলেন যে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধু তাঁহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "হুঁ—নতুন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—'যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক।' জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া

বলিলেন, "এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখছ বুঝি?" জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক, থাক্, আর ভালমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।" লজ্জায়-অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টা-তামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল, "ভাই, আমাদের পাড়ায় যখন কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?" আমরা বলিলাম, "খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?" সে বলিল, "তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয়, আমি সেইখানে ছাদের উপর বার দুয়েক চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, ত্রিসীমানার যত কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালায় কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।'

একবার সে হঠাৎ পেন্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢল্‌ঢলে পায়জামার মতো পেন্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং তাহার কাছে ভারি একটা ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেন্টেলুন পরেছিস্ কেন?" দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরিজি শিখব ব'লে।" আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করায় যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদপেই গান গাহিতে পারে না, তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারে নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন ইস্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য চিৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম, কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাশে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিসপত্র।" জিনিসপত্রটা কিরূপ

হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটা তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কি বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতর দিয়া কি যেন দেখিয়া লইল, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড়বিড় করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মনি-ব্যাগ—ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।" আর একজন বলিল, "টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন? ও কি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময় দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, "ওটা এখন তোমার কাছে রাখো, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দারোয়ানের কাছে দিও।" এই বলিয়া সে বাক্সটি দারোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, এখন দারোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিক বাদে দারোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া, কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দারোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র, আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁটলা ন্যাকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তাহার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার এক পিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর একটি পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়'। দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, "যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টেরও না পায় যে

আমরা খুলেছিলাম। তাহলে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম, "বেশ কথা। ও আস্‌লে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বলো আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বারবার করে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শোনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাশা দেখিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দারোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাহিরে যাওয়ার ভান করা এ সমস্ত তাহার শয়তানি। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে।

সাধে কি বলি 'পাগলা দাশু?'

দাশুর খ্যাপামি

ইস্কুলের ছুটির দিন। ইস্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল, সে-ও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না।

সেই তো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল, তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, "সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!" দাশুর তখন "তবে আয় সম্মুখ সমরে"—ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার "খোল তলোয়ার" ব'লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি "দাঁড়া, দেখছিস না বক্‌লস্ আটকিয়ে গেছে" ব'লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ার খুলে দিলাম, তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞেস করলেন, "কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি," তখন দাশুর বলবার কথা ছিল "নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি," কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে "ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, "না, সে কিছুতেই হবে না।" বিশু বলল, "দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির!"

ট্যাঁপা বলল, "তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!"

দাশু বেচারা প্রথমে খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে।

দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে? তুই এখানে কি করছিস?"

দাশু বলল, "বাঃ, পোশাক পরব না?"

আমি বললাম, "পোশাক পরবি কি রে? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।"

দাশু বলল, "বাঃ খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো?"

শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, "কেন গণশার কি হল?"

দাশু বলল, "কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?" তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারা ইস্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম।

গণশা কাঁদতে লাগল, "না আমি কক্ষণো এক্‌টিং করব না, তাহলে, দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।" আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন-

তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?" ব'লেই আমাকে-বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে।

রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।"

দাশু বলছে, "বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছ'টা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।" এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম, যে গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস্‌, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্‌ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তারা খালি বলবার কথা "দেবতা বিমুখ হলে মানুষ কি পারে?" কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!" এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, "বারবার মহারাজের আশিস্‌ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতে বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে "আবার সে এসেছে ফিরিয়া" ব'লে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ

এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেয়েই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, "বলে যাও কি বলিতেছিলে।" তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু "চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা"—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—"এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা" ইত্যাদি—নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, "যাও সবে নিজ নিজ কাজে" ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগেমেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হয় না।" দাশু বলল, "বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।" আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে গোল বাধিয়ে দিলি? তাই তো সব ঘুলিয়ে গেল।" দাশু বলল, "রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?" রামপদ বলল, "ওকে ধরে ঘা দু'চার লাগিয়ে দে।"

দাশু বলল, "লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?"

চীনেপট্‌কা

আমাদের রামপদ তাহার জন্মদিনে এক হাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র আমরা সকলেই মহাউৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে।" রামপদ বলিল, "কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে—তাহলে মিহিদানা পাবি।" এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দারোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া, কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাসে আসিয়া দেখি, দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?" নিতান্ত ভালোমানুষের মতো দাশু বলিল, "হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।" আমি বলিলাম, "দুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো?" সে এ কথায় ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোনো তাড়াহুড়ো করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম

চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য রকম ধারালো হইয়া উঠে। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই "নদী শব্দের রূপ কর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে, পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়ঘড় শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'কাটকুট' আর 'দশপঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত, তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্‌ফাট্ দুম্‌দাম্ ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত ইস্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন, যত রাজ্যের মিস্ত্রী-মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাদ পিটাইতে লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া, তার পর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া, একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়ফড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবরই হাই জাম্পে ফার্স্ট প্রাইজ পায়, তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' নামতা আওড়াইতেছিল—তাহারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ইস্কুলময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল—দারোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।" দারোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া

বলিলেন, "এ হাঁড়িটা কার?" রামপদ বলিল, "আজ্ঞে আমার।" আর কোথা যায়—অমনি দুই কানে দুই পাক! "হাঁড়িতে কি রেখেছিলি!" রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, "আজ্ঞে ওর মধ্যে মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর—" মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তারপর মিহিদানাগুলো চীনে পট্‌কা হয়ে ফুটতে লাগল, না?" বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাসে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন; তাঁহারাও এক বাক্যে হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনা দোষে রামপদ মার খায় বুঝি! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন?' তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল—এই দেখুন কাটকুটের ঘর কাটা!" শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা, পণ্ডিতমশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "চোপ্ রও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম?" দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, "তবে যে আপনার নাক ডাকছিল?" পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে?" দাশু অম্লানবদনে বলিল, "আমি পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলাম।" শুনিয়াই সকলের চক্ষুস্থির! ছোকরা বলে কি?

প্রায় আধ মিনিটখানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই। তারপর পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কেন পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলে?" দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, "ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না?" এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, "আমার মিহিদানা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমার পট্‌কা আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।" এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু-কিছু ধমক-ধামক করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না। ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, "আমার পট্‌কা, রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। ব্যস্! ওর মার খাওয়াই উচিত।"

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদা ইস্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো। 'ডাকাতে ধরেছিল? বলিস কি রে!' ডাকাত না তো কি? বিকাল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচ্‌কিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—নইলে দড়াম্ করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।" তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, "রাস্তায় সঙ্ সেজে ইয়ার্কি করা হচ্ছিল?" নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় ব'লে উঠল, "আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—" শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, "ফের জ্যাঠামি!" নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক কথা বৃথা—কারণ, সত্যি সত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক ইস্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল, কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুস্‌কুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেছিল। দু'একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো ব'লে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে, সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, "ওটা তো জুতোর ফোস্কা", তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, "যাও, তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।" কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হলো না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে

ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস্? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।" যেমন বলা অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে বই-টই ফেলে, খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যা করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না।

দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবলে, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল না কি?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিত মশাই বললেন, "ওরকম হাসছিলে কেন?" দাশু নবীনকে দেখিয়ে বললে, "ঐ ওকে দেখে।" পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল, "কি রে দেশো! বড় যে হাসতে শিখেছিস!" দাশু বললে, "হাসব না? তুমি কাল ধুনচি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা!" আমরা সবাই বললাম, "সে কি রকম? ধুনচি মাথায় নাচছিল মানে?" দাশু বললে, "তাও জানো না? ওই কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা! বলতে না বারণ করেছিল!" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কি বলছিস ভালো করেই বল্ না।" দাশু বললে, "কালকে শেঠেদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে—তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুনচির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচ্‌কিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।" নবু ভয়ানক রেগে বলল, "তুই তখন কি করছিলি?" দাশু বললে, "তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম—ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়মামাকে ডেকে আনলাম।" নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা, তেমনি তার দেমাক—সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, "তবে যে নবীনদা বলছিল তাকে ডাকাতে ধরেছে?" দাশু বললে, "দুর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?" বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়, তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, "কেষ্টা কই?" কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বললে, "ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।" মোহন বললে, "কিহে ছোকরা, তুমি সব জানো নাকি?" দাশু বললে, "না, সব আর জানব কোত্থেকে—এইতো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেটরি—" মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কি-না?" দাশু বললে, "ঠ্যাঙায়নি তো—মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।" মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বললে, "খুব অল্প মেরেছে, না? তবু কতখানি শুনি?" দাশু বললে, "সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।" মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, "তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?" দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বললে, "ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেই রকম!" এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান ম'লে চিৎকার করে বলল, "দেখ্‌ বেয়াদপ! ফের জ্যাঠামি করবি তো চাব্‌কিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কি-না, আর কি কি দেখেছিলি, সব খুলে বলবি কি-না?"

জানোই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুষি, চড়, আঁচড়, কামড় সে এম্নি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে, ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।" ম্যাট্রিক ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হতো।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "হ্যাঁ রে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?" কেষ্টা বললে, "ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে এক সের জিলিপি পাবি।" আমরা বললাম, "কৈ আমাদের তো ভাগ দিলিনে?" কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কি-না আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচ্‌কেমি করে?

চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চালিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলেমানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত যে, স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, "নাঃ, লোকটা কিছু জানে!" শ্যামচাঁদ প্রথমে যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কি-না! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব ক'টার ভুল তাহার দেখানো চাই-ই চাই! পাঁড়েজি দারোয়ানকে রীতিমতো ধমক লাগাইয়া বলিত, "এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই শ্লো চলছে।" পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই। কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ হ্যাঁ, আভি হাম্‌ রেংলিট কর্‌বে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই একপাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ-কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, "শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুলসুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, সাদাসিধে ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, না—থার্‌মোমিটার নয়—ফাউন্টেন পেন!" শুনিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। ফাউন্টেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট্‌ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তারপর, যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়াচাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলমই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এন্ড ফাউন্টেন পেন কো, ফিলাডেল্‌ফিয়া।"

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উদ্যানে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি ম্যাজিক দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা সাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল। একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটি আস্ত ডিম বাহির করিল। ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামাচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার কাছে ঘড়ি আছে।"

ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো!" তারপর চেনসুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরো ভাঙা লোহা আর কাচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এটাই কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিকবাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন চালিয়াৎ খুব হো হো করে হাসিয়া উঠিল, যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মানিব্যাগ, রূপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে একসঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটি দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া, বিড়বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহাখুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরৎ দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল! তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত টুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, আমি ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনইবা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো ফিরিয়ে দাও দেখি?" শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্য হইতে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল? কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন তাহাকে বলিল, "আর কি নিয়েছ?" তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা! কখনো আমি কিচ্ছু নিইনি।" তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, "এটা বুঝি কিছু নয়?"

এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!

সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাটাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'। আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায়, আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারটি বড়-বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর—এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত।

একদিন আমদের ক্লাসে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগ্রা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সে-ই মোটে পাঁচ মাইল।" সবজান্তা তাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকাল খবর রাখ না!" যখনই তার কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা-তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চেয়ে বেশি জানো?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত। সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা

তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না।" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন"—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিক অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর বোলচালগুলিও বেশ ছিল ঝাঁঝালো রকমের, কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া, আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝিবা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিশের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের টেকা দায়! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন শোনা গেল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি ফুটবল গ্রাউন্ড ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম, রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়! কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয়ে জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে

দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলে আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সেসকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—একদিন আমি দার্জিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, "দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজ কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন!" উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই 'ক্যাসাবিয়াংকা' থেকে আবৃত্তি করলুম। তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে, 'আবার কর।' মহামুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হলো।

এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "রামলালবাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহগোছের পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, "রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেই রকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বল কি হে? তোমার বয়স কত?" "আজ্ঞে এইবার তেরো পূর্ণ হবে।" "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?" সব জান্তা বলিল, "দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। ইস্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি মামার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন—"দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর্—এটি আমরা ভাগনে দুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "আমার পরিচয় জানো না বুঝি?" সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, "আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।"

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছেন। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা 'কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইতে না, একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদঅভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না সে কাজেও সে চট্‌পট্‌ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'—আর সমবয়সীরা বলে 'ফড়ুফড়ি রাম'! কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিক্সনারি সবচাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েবস্টারের ডিক্সনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এম্নি মোটা আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো।" উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন "এটা কিসের কল ভাই?" বলিয়া সেটাকে নাড়িয়াচাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনেশুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হলো বুঝি? দেখ্‌ তো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না

জানুক সাততাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চুরি করছে তোমরা কেউ কিছু জানো?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, "তা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।" মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন? ও রকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।" মাস্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সেকথা ভাবিলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সবচাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের ইস্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল, সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন

তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি, তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল, অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে। সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে যে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চিৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল।

ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা হঠাৎ 'ভূত-ভূতুম-ভূত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চিৎকারেই অজ্ঞান!

কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহাউৎসাহে 'হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চিৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্‌লা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুম্‌দুম্‌ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য

করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে চিল্‌লানে দেও।"

এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুল বাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুম্‌দুম্‌ শব্দ আর চিৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইঝির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সার্সির কাচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্যে কলেজ বাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। যখন সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে অন্তত মাস তিনকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

আশ্চর্য কবিতা

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্‌রি লিখতে পারি!" একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলায় ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা!

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোনোনি

বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে।
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে,
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে,
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভরতি হইয়াছে, আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরো হয়। তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে, এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ফের যদি আমার নামে পোইট্‌রি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।" হরেরাম বলিল, "আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।"

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা ইস্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। ইস্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া ইস্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল,
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো, কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড় জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে—'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর—এমন সময় গুরু গম্ভীর গলা শোনা গেল—"ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে?" ফিরিয়া দেখে হেডমাস্টার মহাশয়! শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?" যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্‌স্পেকটার ইস্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেকটার ইস্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ-পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেডমাস্টার মহাশয় ইন্‌স্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথা! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট বড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানা সুরে চীৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা কর্তালের মতো ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দারোয়ান হইতে আফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ

করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "এত চেঁচালে কেন?" সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "কে কে চেঁচিয়েছিল?" পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল— "শ্যামলাল।"

শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘণ্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বিতম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?" বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বিষস্য বিষমৌষধম্, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যে কবিতা লিখেছ, তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা এক মাস প্রতিদিন পঞ্চাশ বার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।" এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে, গুণে দেখি চৌদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য!
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

এক মাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশ বার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য গুণ— তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হোক সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসেবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিমাল্ অঙ্গ ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন কেন? আর একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই!

সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচিশ পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্ক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে, তাহারইবা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—ও নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি

মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও ভালো করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না! সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল, তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটি হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা যা! মেলা বক্‌বক্ করিসনে!" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-একটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভূগোল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি সব চট্‌পট্ মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থ-পুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানকভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না; কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অম্নি ভুল করলেই এবার ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য

নন্দর কোনো ভাবনা নাই। তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাইজটার উপরে! একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে, তার অর্থ কি?" নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত 'আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি', কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল। খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কৈ! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন্ প্রাইজটা নিচ্ছ?" খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশি দিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা। তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই।

হায় হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নন্দ বলিল, "কপাল মন্দ!"

নতুন পণ্ডিত

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের ধমক-ধামক না করিতেন তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম, তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাড়ি কামানো, গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি 'শ্যামাচরণ কার নাম?' বলিয়া ক্লাশে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিস্‌নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁর বদলে যিনি আসিলেন, তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল

আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষুস্থির!

ফকিরচাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা ক'দিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—" পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?" বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?" পণ্ডিত মহাশয় "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশসুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন ইস্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পণ্ডিত মহাশয় "হাসছ কেন" বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল, শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—"কেবল হাসি?" বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন। দেখিতে দেখিতে ইস্কুলসুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে "পড়ছ না কেন?" বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।" তিনি আবার বলিলেন, "তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।" যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর

কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুলে ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, এক টাকা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি গিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হরে চেঁচায়নি, আমি চেঁচিয়েছি।" রামবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত মশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল, "পণ্ডিত মশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

"অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড

তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—"

এই সময় নূতন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই "তবে রে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে ইস্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনো দিন তাঁকে ইস্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুই দিন পরে পুরাতন পণ্ডিত মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁর ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

সবজান্তা দাদা

'এই দ্যাখ্ টেঁপি, দ্যাখ্—কি রকম করে হাউই ছাড়তে হয়। বড় যে রাজুমামাকে ডাকতে চাচ্ছিলি? কেন, রাজুমামা না হলে বুঝি হাউই ছোটানো যায় না? এই দ্যাখ্।"

দাদার বয়স প্রায় বছর দশেক হবে, টেঁপির বয়স মোটে আট, অন্য অন্য ভাইবোনেরা আরও ছোট। সুতরাং দাদার দাদাগিরির আর অন্ত নেই! দাদাকে হাউই ছাড়তে দেখে টেঁপির বেশ একটু ভয় হয়েছিল, পাছে দাদা হাউইয়ের তেজে উড়ে যায়, কি পুড়ে যায়, কিম্বা সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যায়। কিন্তু দাদার ভরসা দেখে তারও একটু ভরসা হল।

দাদা হাউইটকে হাতে নিয়ে, একটুখানি বাঁকিয়ে ধরে বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, "এই সলতের মতো দেখছিস, এইখানে আগুন ধরাতে হয়। সল্‌তেটা জ্বলতে জ্বলতে যেই হাউই ভস্ ভস্ করে ওঠে অমনি ঠিক সময়টি বুঝে—এই এম্নি করে হাউইটিকে ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই হচ্ছে আসল বাহাদুরি। কাল দেখলি তো, প্রকাশটা কি রকম আনাড়ীর মতো করছিল। হাউই জ্বলতে না জ্বলতে ফস করে ছেড়ে দিচ্ছিল। সেইজন্যই হাউইগুলো আকাশের দিকে না উঠে নিচু হয়ে এদিক সেদিক বেঁকে যাচ্ছিল।"

এই বলে সবজান্তা দাদা একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ভাইবোনেরা সব অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। দেশলাইয়ের আগুনটি সল্‌তের কাছে নিয়ে দাদা ঘাড় বাঁকিয়ে, মুচকি হেসে আর একবার টেঁপিদের দিকে তাকালেন। ভাবখানা, এই যে, আমি থাকতে রাজুমামা-ফাজুমামার দরকার কি?

ফ্যাঁস্—ফোঁস্—ছরর্‌র্! এত শিগগির যে হাউইয়ে আগুন ধরে যায় সেটা দাদার খেয়ালেই ছিল না, দাদা তখনো ঘাড় বাঁকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে নিজের বাহাদুরির কথা ভাবছেন। কিন্তু হাসিটি না ফুরাতেই হাউই

যখন ফ্যাঁস্ করে উঠল তখন সেই সঙ্গে দাদার মুখ থেকেও হাঁউ-মাউ গোছের একটা বিকট শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। আর তার পরেই দাদা যে একটা লম্ফ দিলেন, তার ফলে দেখা গেল যে ছাতের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে অত্যন্ত আনাড়ীর মতো হাত-পা ছুঁড়লেন। কিন্তু তা দেখবার অবসর টেঁপিদের হয়নি। কারণ দাদার চীৎকার আর লম্ফভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে তারাও কান্নার সুর চড়িয়ে বাড়ির ভিতর দিকে রওনা হয়েছিল।

কান্না-টান্না থামলে পর রাজুমামা যখন দাদার কান ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল, দাদার হাতের কাছে ফোস্কা পড়ে গেছে আর গায়ের দু-তিন জায়গায় পোড়ার দাগ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য দাদার তত দুঃখ নেই, তার আসল দুঃখ এই যে, টেঁপির কাছে তার বিদ্যেটা এমন অন্যায়ভাবে ফাঁস হয়ে গেল। রাজুমামা চলে যেতেই সে হাতে মলম মাখতে মাখতে বলতে লাগল, কোথাকার কোন দোকান থেকে হাউই কিনে এনেছ—ভালো করে মশলা মেশাতেও জানে না। বিষ্টু পাঠকের দোকান থেকে হাউই আনলেই হত। বার বার বলেছি—রাজুমামা হাউই চেনে না, তবু তাকেই দেবে হাউই কিনতে!

তারপর সে টেঁপিকে আর ভোলা, ময়না আর খুক্নুকে বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে, সে যে চেঁচিয়েছিল আর লাফ দিয়েছিল, সেটা ভয়ে নয়, হঠাৎ ফুর্তির চোটে!

যতীনের জুতো

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, "এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর, তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।"

যতীনের চটি লাগে প্রতি মাসে একজোড়া। ধুতি তার দু'দিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুম্‌ড়ান, শ্লেটটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফাটা। শেলেটের পেন্‌সিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট ছোট টুকরো টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল লেড্‌পেন্‌সিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেন্‌সিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাশের মাস্টার মশাই বলতেন, "তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?"

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙ্গোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দু'দিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়্‌দুড়্‌ করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, "ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।" কিন্তু মুচি ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত! সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটা তার মনে লাগত সেটিকে যে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হত। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁটি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে

আরম্ভ করলে তার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন ইস্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে নামতে লাগল। শেষকালে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে, সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল! যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নিচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই সাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, "তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতো জোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত।" যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?" মুচিরা বলল, "তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে কর, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে ছোটো, তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়ুদুড়ু করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যেই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিস পত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।" মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, "নাও, সেলাই কর।" যতীন রেগে বলল, "আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।" মুচি একটু হেসে বলল, "একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হল? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই কর।" যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, "আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।" মুচি বলল, "আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।" যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, "কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।" মুচি বলল, "সে কি! সব কাজ শেষ না করে

তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতার উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজির কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আর কি কি জিনিস নষ্ট কর দেখা যাবে।"

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যিস এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এস। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি উঠবে নামবে।" যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নিচে আসলে মুচিরা বলল, "হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়েছ। আবার ওঠ। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙ্গোবে না।" এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল, সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, "আচ্ছা, এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চল দরজির কাছে।"

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দরজিরা বসে বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা জিগ্‌গেস করল, "কি? কি ছিঁড়েছ?" মুচিরা উত্তর দিল, "নতুন ধুতিটা, দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।" দরজীরা মাথা নেড়ে বলল, "বড় অন্যায়, বড় অন্যায়! শিগগির সেলাই কর।" যতীনের আর 'না' বলবার সাহস হল না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবে মাত্র দুফোঁড় দিয়েছে, অমনি দরজিরা চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে কি সেলাই বলে? খোল খোল।" অমনি করে বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, "খোল, খোল।" শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলে বলল, "আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কখনও কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।" তাতে দরজিরা হাসতে হাসতে বলল, "খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।" এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেবার পেন্‌সিল কতকগুলো এনে দিল। "তুমি তো পেন্‌সিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।"

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগ্‌গির আমার লেজটা ধর।" যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজিরা বড় বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নিচের দিকে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটার কি হল কে জানে! যতীন দেখল সে সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, "আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?"

আসল কথা—যতীন এখনও সেই মুচিদের আর দরজীদের কথা ভুলতে পারেনি।

ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে, এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কি করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে, "আপনারা একটুও সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি, জানলার গায়ে এমনভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্‌ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।"

সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম, সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। বলল, "ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক্‌, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দু'চার যেতে দাও না।"

দু' মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ইস্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা

থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ! এই বেলা যে তোমার চোর-ধরাবুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?"

জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর না।" তখন সে খুব সাবধানে কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, ইস্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে, তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে। কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দু'দিন না যেতেই আবার চুরি! পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল বাড়ি মাথায় করে তুলল।

আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচাসনে। তাহলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে?

তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দু'দিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়া ছিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।"

শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগ্‌গেস কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে-খেয়াল হয়নি! ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক, আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে? কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর ক'দিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা

ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিন খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।"

তারপর দু'দিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা এম্নি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দু'দিন পর সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টার মশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল।

জলধর বলল, "দেখ চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে, তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।"

আমাদের রামপদ ব'লে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনো দিনই খুব বেশি নয়।"

জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত। রাক্ষসের মতো খানিকটা খেলেই বুঝি ষণ্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা

বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাৎ সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল—এ-সব তারই কাণ্ড!"

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁ দিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই শাদা মতন কি একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলো বেড়াল—তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা জিগ্‌গেস করলাম, "কেমন হে ডিটেক্‌টিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?"

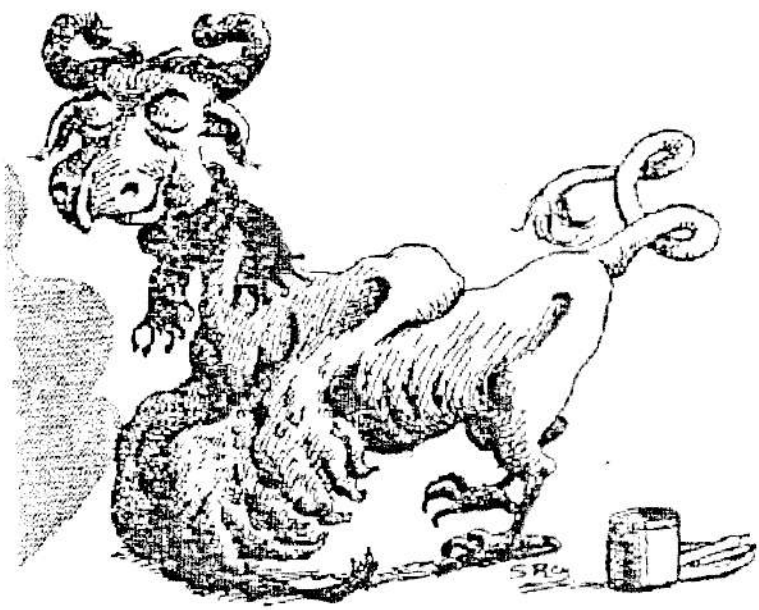

ব্যোমকেশের মাঞ্জা

'টোকিয়ো—কিয়োটো—নাগাসাকি—য়োকোহামা'—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে, এর পরেই ব্যোমকেশের পালা, কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দুটো-দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে-কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়া রকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়্‌কড়ে এমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখলে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ি সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে, আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে, এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল—"তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।"

ঐ রকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে সুতো-মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীন দেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যা-ও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন, সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরি রকম ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চিনে শিরীষ, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দু-বার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীন দেশের নদী দেখাও" তখন বেচারা একেবারেই দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বললে—"সাংহাই।"

সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজ মামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা, তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে—বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়-চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তাঁর কানের উপর মাস্টার মশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কান দুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারানো ঘুড়ির পিছনে উধাও হয়ে, আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরে মাঞ্জা-দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল, সে জানে কেবল ব্যোমকেশ।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ বন্ধু পাঁচকড়িকে বলল, "দেখেছিস পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হচ্ছে! এ-সব কিন্তু নেহাত বাড়াবাড়ি। না হয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস বাপু, তার জন্যে এত কি গিরিম্বাড়ি!" এই ব'লে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা খুলে বলল। শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা যদি বলিস, তুই আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ মশলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভস্‌ভস্‌ করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হলে কারু মাঞ্জার সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।" শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুব রকম বিশ্বাস হল যে, ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য রকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চার বছরের ছোট হয়ে, সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা যোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়ে ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি থলের মধ্যে কি যেন মশলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখে সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বললে, 'বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি

পেয়েছি'—এই ব'লে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আস্‌লে এর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি চাইলে যদি না দেয়? তারপর ভাবলে, দূর! ভারি তো জিনিস, তা আবার চাইবার দরকার কি? এই এতটুকু মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশো গজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবল মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির!

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে, মহা উৎসাহে মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড়কড় করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, "যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়গে যা।"

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখল যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোর জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে, কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে? যাহোক, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে, চট করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময় হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কল্‌কে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা মাখানো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভস্‌ভস্‌ করে কাগজ জ্বলে উঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-টাগুন লেগে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! অনেক চেঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেওয়া হল, তখন তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, "হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল্‌ তো?" ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "কিচ্ছু তো রাখিনি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।" দাদা তার কৈফিয়ৎটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে, "আবার এয়ার্কি হচ্ছে?" ব'লে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন। বেচারা ব্যোমকেশ এই ব'লে তার

মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত।

বিকেলে সে বাড়ি এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল, 'ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে বলে।' এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ করে বললে, "শুনেছিস?" ব্যোমকেশ বললে, "না—কি হয়েছে?" পাঁচু বললে, "ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করেছে।" ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড় হাঁ করে জিগ্‌গেস করলে, "দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?" শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, "বলছি লাল নীল জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!"

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মশলা-মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। সেইসময় ডাক্তারদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে, ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপরে ফর্‌ফর্ করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "আমার অসুখ করেছে।"

জগ্যিদাসের মামা

তার আসল নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাশে এল, পণ্ডিতমশাই তার নাম শুনেই ভ্রূকুটি করে বললেন, "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বললে তবু না হয় বুঝি।" ছেলেটি বলল, "আজ্ঞে, আমি তো নাম রাখিনি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই।"

এই শুনে আমি একটু ফিক্ করে হেসে ফেলেছিলাম, তাই পণ্ডিত মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বানান কর যজ্ঞদাস।" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "বর্গীয় জ"—পণ্ডিতমশাই বললেন, "দাঁড়িয়ে থাক।" তারপর একটি ছেলে ঠিক বানান বললে পর তিনি আরেকজনকে বললেন, "সমাস কর।" সে তার সংস্কৃত বিদ্যা জাহির করে বললে, "যোগ্য শ্চেতি দাসশ্চাসৌ।" পণ্ডিত মশাই তার কান ধরে বললেন, "বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক।"

দু'দিন না যেতেই বোঝা গেল যে, জগ্যিদাসের আর কোনো বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি তার অসাধারণ। একদিন সে ইস্কুলে দেরি করে এসেছিল। কারণ জিগ্‌গেস করাতে সে বলল, "রাস্তায় আসতে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ করে আমায় তেড়ে এসেছিল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কুণ্ডুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছিলাম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা একসঙ্গে চোখে দেখিনি, কাজেই কথাটা মাস্টারমশাইও বিশ্বাস করেননি। তিনি জিগ্‌গেস করলেন, "এত মিছে কথা বলতে শিখলে কার কাছে?" জগ্যিদাস বলল, "আজ্ঞে, মামার কাছে।" সেদিন হেডমাস্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু জগ্যিদাস যে খুশি হয়নি সেটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড় বড় চোখ করে গম্ভীর গলায় তার মামাবাড়ির ডাকাত ধরার গল্প বলত, তখন বিশ্বাস করি আর না করি, শুনতে শুনতে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হয়ে আসত। জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য ঠেকত! তাঁর গায়ে নাকি যেমন জোর, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি। তিনি যখন 'রামভজন' ব'লে

চাকরকে ডাক দিতেন, তখন ঘর বাড়ি সব থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট বল, সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফটো এনে দেখাল। দেখলাম পালোয়ানের মতো চেহারা বটে! এক-একবার ছুটি হত আর জগ্যিদাস তার মামার বাড়ি যেত, আর এসে যে সব গল্প বলত তা কাগজে ছাপবার মতো। একদিন স্টেশনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা, একটা গাড়ির মধ্যে মাথায় পাগড়ি বাঁধা চমৎকার জাঁদরেল চেহারার একটি কোন্‌ দেশী ভদ্রলোক বসে। আমি ইস্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিগ্‌গেস করলাম, "ঐ পাগড়ি বাঁধা জাঁদরেল লোকটাকে দেখেছিলি?" জগ্যিদাস বলল, "ঐ তো আমার মামা।" আমি বললাম, "ফটোতে তো কালো দেখেছিলাম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার সিম্‌লে গিয়ে ফরসা হয়ে এসেছেন।" আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম।" জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা তো ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা, না হয় মাঝে মাঝে দুটো একটা গল্প ব'লে থাকি। তা ব'লে কি সবই আমার গল্প। আমার জলজ্যান্ত মামাকে সুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও?" এ-কথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে, ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছিলাম।"

তারপর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই ব্যস্ত হয়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোনোদিন শুনতাম মামা গেছেন হাতি গণ্ডার বাঘ মারতে। কোনোদিন শুনতাম, একাই তিনি পাঁচটা কাবুলীকে ঠেঙিয়ে ঠিক করেছেন, এরকম প্রায়ই হত। তারপর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প করছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে এসে বললেন, "যজ্ঞদাস, তোমার মামা এসেছেন।

হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে গেল—সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তারপর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ মাস্টার মশায়ের সঙ্গে চলল। আমরা বললাম, "ভয় হবে না? জানো তো কি রকম মামা!" সবাই মিলে উৎসাহ আর আগ্রহে মামা দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়লাম। গিয়ে দেখি, একটি রোগা কালো ছোকরা গোছের ভদ্রলোক, চশমা চোখে গোবেচারের মতো বসে আছেন, জগ্যিদাস তাঁকেই গিয়ে প্রণাম করল।

সেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের রাগ হয়েছিল। এম্নি করে ফাঁকি দেওয়া! মিথ্যে করে তার মামা তৈরি! সেদিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস কেঁদেই ফেলল। সে তখন স্বীকার করল যে, ফটোটা কোনো এক পশ্চিমা পালোয়ানের। আর সেই ট্রেনের লোকটাকে সে চেনেই না। তারপরে কোনো আজগুবি জিনিসের কথা বলতে হলেই আমরা বলতাম, 'জগ্যিদাসের মামার মতো।'

আজব সাজা

"পণ্ডিতমশাই, ভোলা আমায় ভ্যাংচাচ্ছে।" "না পণ্ডিতমশাই, আমি কান চুলকোচ্ছিলাম, তাই মুখ বাঁকা মতো দেখাচ্ছিল!" পণ্ডিতমশাই চোখ না খুলিয়াই অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "আঃ! কেবল বাঁদরামি! দাঁড়িয়ে থাক।" আধমিনিট পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর আবার শোনা গেল, "দাঁড়াচ্ছিস না যে?" "আমি দাঁড়াব কেন?" "তোকেই তো দাঁড়াতে বললে।" "যাঃ আমায় বলেছে না আর কিছু! গণশাকে জিগ্‌গেস কর? কিরে গণশা, ওকে দাঁড়াতে বলেছে না?" গণেশের বুদ্ধি কিছু মোটা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া পণ্ডিতমশাইকে ডাকিতে লাগিল, "পণ্ডিতমশাই!"

পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্ না।"

গণেশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে দাঁড়াতে বলেছেন, পণ্ডিতমশাই?" পণ্ডিতমশাই কট্‌মটে চোখ মেলিয়াই সাংঘাতিক ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে বলছি, দাঁড়া।" বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। আবার মিনিট খানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ ভোলা বলিল, "ওকে এক পায়ে দাঁড়াতে বলেছিল না ভাই?"

গণেশ বলিল, "কক্ষণো না, খালি দাঁড়া বলেছে।" বিশু বলিল, "এক আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তার মানেই এক পায়ে দাঁড়া।" পণ্ডিতমশাই যে ধমক দিবার সময় তর্জনী তুলিয়াছিলেন, এ কথা গণেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশু আর ভোলা জেদ করিতে লাগিল, "শিগগির এক পায়ে দাঁড়া বলছি, তা না হলে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।"

গণেশ বেচারা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমনি ভোলা আর বিশুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। এ বলে ডান পায়ে

দাঁড়ানো উচিত; ও বলে, না, আগে বাঁ পা। গণেশ বেচারার মহামুশকিল! সে আবার পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, "পণ্ডিতমশাই, কোন পা?"

পণ্ডিতমশাই তখন কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। গণেশের ডাকে হঠাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিক রকম বিষম খাইয়া ফেলিলেন। গণেশ বেচারা তার প্রশ্নের এ রকম জবাব একেবারেই কল্পনা করে নাই, সে ভয় পাইয়া বলিল, "ঐ যা কি হবে?"

ভোলা বলিল, "দৌড়ে জল নিয়ে আয়।" বিশু বলিল, "শিগ্‌গির মাথায় জল দে।" গণেশ এক দৌড়ে কোথা হইতে একটা কুঁজো আনিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া পণ্ডিতমশায়ের টাকের উপর জল ঢালিতে লাগিল। পণ্ডিতমশায়ের বিষম খাওয়া খুব চট্‌পট্ থামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া গণেশের হাতের জলের কুঁজা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভয়ে সকলেই খুব গম্ভীর হইয়া রহিল, খালি শ্যামলাল বেচারার মুখটাই কেমন যেন আহ্লাদি গোছের হাসি হাসি মতো, সে কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিল না।

পণ্ডিত মশায়ের রাগ হঠাৎ তার উপরেই ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। তিনি বাঘের মতো গুম্‌গুমে গলায় বলিলেন, "উঠে আয়!" শ্যামলাল ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি করলাম? গণশা জল ঢাল্‌লে, তা আমার দোষ কি?"

পণ্ডিত মশাই মানুষ ভালো, তিনি শ্যামলালকে ছাড়িয়া গণশার দিকে তাকাইয়া দেখেন, তাহার হাতে তখনও জলের কুঁজা। গণেশ কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "ভোলা আমাকে বলেছিল।" ভোলা বলিল, আমি তো খালি জল আনতে বলেছিলাম। বিশু বলেছিল, মাথায় ঢেলে দে।" বিশু বলিল, "আমি কি পণ্ডিত মশায়ের মাথায় দিতে বলেছিলাম? ওর নিজের মাথায় দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুদ্ধিটা ঠাণ্ডা হত।"

পণ্ডিত মশাই খানিকক্ষণ কটমট করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া তারপর বলিলেন, "যা! তোরা ছেলেমানুষ তাই কিছু বললাম না। খবরদার আর অমন করিসনে।" সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু পণ্ডিত মশাই কেন যে হঠাৎ নরম হইয়া গেলেন, কেহ তাহা বুঝিল না। পণ্ডিত মশায়ের মনে হঠাৎ যে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোন দুষ্টুমির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহা কেবল তিনিই জানেন।

কালাচাঁদের ছবি

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাস্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ?" কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম।" হেড মাস্টার মশায় বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে?" কালাচাঁদ খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি আমায় চটাচ্ছিল।" হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল?" "না।" "ধমকিয়েছিল?" "না।" "তবে?" "বার বার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বোকার মতো কথা বলছিল, তাই, আমার রাগ হয়ে গেল।" হেডমাস্টার মশাই তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন থেকে একটু সংশোধন করতে চেষ্টা কর।"

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামকা ঐ নিধেটাকে মারতে গেলি কেন?" কালাচাঁদ বলিল, "খামকা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞাসা কর না!" নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামকা নয় তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস, তার কথা আমায় জিগ্‌গেস করতে গেলি কেন? আর যদি জিগ্‌গেস করলি, তাহলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?" আমরা বললাম, "আরে কি হয়েছে খুলেই বল্ না কেন।"

নিধিরাম বলিল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে, ছবির নাম—খাণ্ডব দাহন। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিগ্‌গেস করল, "কেমন হয়েছে?" আমি বললাম, "এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শিয়াল ছুটছে?" কালাচাঁদ বলল, "না, না, মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ। আর এগুলো তো শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া।" আমি বললাম, "সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?" কালাচাঁদ বলল, "আহা তা

কেন? ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র। দেখছ না কৃষ্ণের হাতে রয়েছে? আর তালগাছ কোথায় দেখলে? ওটা তো অর্জুনের পাতাকা! আর ঐগুলোকে বুঝি পদ্মফুল বলছ? ওগুলো দেবতা—খুব দূরে আছেন কিনা, তাই ছোট ছোট দেখাচ্ছে। আর এই বুঝি চামচিকে হল, এটা তো গরুড়পাখি! একটা সাপকে তাড়া করছে।" আমি বললাম, "তা হবে। আমি ওসব বুঝিটুঝি না। আচ্ছা ঐ কালো কাপড় পরা মেয়েমানুষটি যে ওদের মারতে আসছে, ওটি কে?" কালাচাঁদ বলল, "তুমি তো মহা মুখ্যু হে! ওটা গাছে গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পারছ না? অবাক করলে যে!"

তখন আমি বললাম, "আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডব দহন না করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন? ঐ গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা-টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও, কৃষ্ণ অর্জুন আছেন তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হতে পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হয়ে যাবে। তারপর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানা দুটো মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন। কালাচাঁদ বলল, "হনুমানও হতে পারে নিধিরামও হতে পারে।"

আমি বললাম, "তাহলে ভাই, আর এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও। তাহলে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছেন। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিও। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল তো আছেই—ঐ গাছটাকে একটু নাক-মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তারপর রাজসুয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই বাস্!"

কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হল না, তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আবার বললাম, "তাহলে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর না কেন? ঐ রথটা জন্মেজয় আর কৃষ্ণকে জটা-দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে ঘিয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘি ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া! একটা সাপ আছে, আরও কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জুনকে কর আস্তীক, সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে—তিষ্ঠ তিষ্ঠ। আর ঐ চামচিকেটা, মানে গরুড়টা, ওটাকে মুনি-টুনি কিছু একটা বানিয়ে দিও।"

পতাকাটাকে কি রকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "থাক, থাক, আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই। সর দেখি।"

আমি বললাম, "তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি তো আর বলছি না যে আমার পরামর্শ মতো তোমাকে চলতে হবে। পছন্দ হয় কর, না হয়তো কোরো না, বাস্। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামতো না করে অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্র মন্থন করে দিলেও তো হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড় গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে, অর্জুনের পিছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলো অসুর—কথাটা ভালো করে বলতে না বলতেই কালাচাঁদ আমার কান ধরে মারতে লাগল। আচ্ছা, দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধুভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয়নি বলেই আমায় মারবে? যা বলেছি সব শুনলে তো, এর মধ্যে এত রাগ করবার কি হল বাপু?"

বাস্তবিক, কালাচাঁদের এ বড় অন্যায়! সে রাগ করিল কিসের জন্য? নিধিরাম তাহাকে মারে নাই ধরে নাই বকে নাই, গাল দেয় নাই, চোখ রাঙায় নাই, মুখ ভ্যাংচায় নাই—তবে রাগ করিবার কারণটা কি?

ব্যাপার কি বোঝা গেল না, তাই সন্ধ্যায় সবাই মিলিয়া কালাচাঁদের বাড়িতে গেলাম। আমি বলিলাম, "ভাই কালাচাঁদ, আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখতে চাই। সেই যে সমুদ্র লঙ্ঘন না কি যেন?"

রামপ্রসাদ বলিল, "দ্যুৎ সমুদ্র লঙ্ঘন কিসের? অগ্নিপরীক্ষা।" আর একজন কে যেন বলিল, "না, না, কি একটা বধ।" কেন জানি না, কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "যাও ইয়ার্কি করতে হবে না," বলিয়া সে তাহার ছবির খাতাখানি ফড়ফড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—আর রাগে গজরাইতে লাগিল।

আমরা হতভম্ব হইয়া রহিলাম। সকলেই বলিলাম, "কালাচাঁদের মাথায় বোধহয় একটু পাগলামির ছিট্ আছে। নইলে সে খামকা এত রাগ করবে কেন?"

গোপালের পড়া

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করিয়া দু-একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিনতলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে গোপলা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?" গোপাল বলিল, "তিনতলায় পড়তে যাচ্ছি।"

মামা—"পড়বি তো তিনতলায় কেন? এখানে বসে পড় না।"

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া-আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা মন দিয়ে পড়গে।"

গোপাল চলিয়া গেল। মামাও মনে মনে একটু খুশি হইয়া বলিলেন, "যাক, ছেলেটার পড়াশুনায় মন আছে।'

এমন সময় ভোলাবাবুর প্রবেশ—বয়স তিন কি চার, সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিনতলায় পড়াশুনা করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, "দাদা কেন পড়াশুনা করছে? পড়াশুনা করলে কি হয়? কি করে পড়াশুনা করে?" ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমার লজেঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা ঘরে ভোলাবাবুর পুনঃপ্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনা করব।"

মামা বলিলেন, "বেশ তো আর একটু বড় হও, তোমার রঙচঙে সব পড়ার বই কিনে এনে দেব।"

ভোলা—"না, সে রকম পড়াশুনা নয়, দাদা যে রকম পড়াশুনা করে সেইরকম।"

মামা—"সে আবার কি রে?"

ভোলা—"হাঁ, সেই যে পাতলা-পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।"

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিনতলায় উঠিলেন, চুপি চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর ধনুর্ধর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বই দুটি ঠিক দরজার কাছে তক্তাপোশের উপর পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা দখল করিয়া নিচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ছুটির আর ক'দিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল, "আঠারো দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনা করছিস তো? না, কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস?"

গোপাল—"না, এই তো এতক্ষণ পড়ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়তে বুঝি বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাতলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানারকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের চক্ষু তো স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "বই কোথায়?"

গোপাল বলিল, "তিনতলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলো কি?" তারপর তাহার কানে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন। গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য মামার জিম্বায় বন্ধ রহিল।

পেটুক

'হরিপদ! ও হরিপদ!'

হরিপদর আর সাড়াই নেই! সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি? কানে কম শোনে বুঝি? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিষ্কার শুনতে পায়। তবে হরিপদ কি বাড়ি নেই? তা কেন?? হরিপদর মুখ ভরা ক্ষীরের লাড়ু, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। কথা বলবে কি করে? আবার ডাক শুনে ছুটে আসতেও পারে না—তাহলে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিলছে আর জল খাচ্ছে, আর যতই গিলতে চাচ্ছে, ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। বিষম খাবার যোগাড় আর কি!

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদভ্যাস! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি, কত সাজাই যে সে পেয়েছে তবু তার আক্কেল হল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মতো খাবেই। যেমন হরিপদ, তেমন তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেট রোগা, দু'দিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তাদের আর যায় না। যেদিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয়, তারপর কয়েক দিন ধরে প্রতিজ্ঞা থাকে, 'এমন কাজ আর করব না।' যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কামড়ায়, তখন কাঁদে আর বলে, 'আরে না, এইবারেই শেষ!' কিন্তু দু'দিন না যেতেই আবার যেই সেই।

এই তো কিছুদিন আগে পিসিমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হয়েছিল, কিন্তু তবু তো লজ্জা নেই! হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বলল, "দাদা, শিগ্‌গির এস। পিসিমা এই মাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।" দাদাকে এত ব্যস্ত হয়ে এ-খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসিমার ঘরে যে শিকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে লাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে

শিকলটা খুলে আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাবল তুলে নিয়ে খপ করে মুখে দিয়েছে। মুখে দিয়েই চীৎকার! কথায় বলে 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে,' কিন্তু হরিপদর চেঁচানো তার চাইতেও সাংঘাতিক! চীৎকার শুনে মা-মাসি-দিদি-পিসি যে যেখানে ছিলেন, সব 'কি হল' বলে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চীৎকারের নমুনা শুনেই দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে হাজির! সেখানে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদর অবস্থা দেখে পিসিমা বুঝেছেন যে হরিপদ দই ভেবে তাঁর চুনের হাঁড়ি চেখে বসেছে! তারপর হরিপদর যা সাজা! এক সপ্তাহ ধরে সে না পারে চিবোতে, না পারে গিলতে, তার খাওয়া নিয়েই এক মহাহাঙ্গামা! কিন্তু তবু তো তার লজ্জা নেই! আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড়ু খেতে গিয়েছে। ওদিকে মামা তো ডেকে ডেকে সারা!

খানিক বাদে মুখ ধুয়ে মুছে হরিপদ ভালোমানুষের মতো এসে হাজির। হরিপদর বড়মামা বললেন, "কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" হরিপদ বলল, "এই তো, উপরে ছিলাম।" "তবে, আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম, তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে?" হরিপদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা।" "শুধু জল? না, কিছু স্থলও ছিল?" হরিপদ শুনে হাসতে লাগল যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর করে এসে হাজির। তিনি ভিতর থেকে খবর এনেছেন যে, হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশ-বারোখানা ক্ষীরের লাড়ু কম পড়েছে। তিনি এসেই হরিপদর বড়মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিস্‌ফাস্ কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "বাড়িতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁদুর মারবার একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে আর চলছে না। চারিদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম! এই পাড়াসুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড়ু পাকাতে—সেইগুলো একবার ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুরের বংশ নির্বংশ হবে!"

হরিপদ জিগ্‌গেস করল, "লাড়ু কবে পাকানো হবে?" বড়মামা বললেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে, সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একথালা ক্ষীর নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড়ু পাকাতে বসেছে।" হরিপদর মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে এল, সে খানিকটা ঢোক গিলে বলল, "সেঁকো বিষ খেলে কি হয় বড়মামা?" "হবে আবার কি? ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, এই হয়।" "আর যদি

মানুষে এই লাড়ু খেয়ে ফেলে?" "তা একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে তো নাও মরতে পারে—গলা জ্বলবে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়তো হাত-পা খিঁচবে।" "আর যদি একেবারে এগারোটা লাড়ু খেয়ে ফেলে?" বলে হরিপদ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তখন বড়মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলিস কিরে! তুই খেয়েছিস নাকি?" হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হ্যাঁ বড়মামা, তার মধ্যে পাঁচটা খুব বড় ছিল। তুমি শিগ্‌গির ডাক্তার ডাক বড়মামা, আমার কি রকম গা ঝিম্‌ঝিম্ আর বমি বমি করছে।"

মেজমামা দৌড়ে গিয়ে তার বন্ধু রমেশ ডাক্তারকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তেতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁঝ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললেন। তারপর একটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ানো হল। সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে, খেয়েই হরিপদ ওয়াক্ ওয়াক্ করে বমি করতে লাগল।

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, চিরতার জল আর সাগু খেয়ে থাকবে। হরিপদ বলল, "আমি উপরে মা-র কাছে যাব।" ডাক্তার বললেন, "না, যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাকবে।" বড়মামা বললেন, "হাঁ, মা-র কাছে যাবে না আরো কিছু! মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই।"

তিনদিন পরে যখন সে ছাড়া পেল, তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই, সে একেবারে বদলে গেছে। তার বাড়ির লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি ব্যারাম হয়েছিল, তার মা জানেন যে বেশি পিঠে খেয়েছিল বলে হরিপদর পেটের অসুখ হয়েছিল। হরিপদ জানে সেঁকো বিষ খেয়ে সে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানেন কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানেন রমেশ ডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা এই গল্প পড়েছ।

ভুল গল্প

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রের আবার তেমনি হাত খোলা। দুজনের বহুকালের বন্ধুতা, অথচ কি চেহারায়, কি স্বভাব-প্রকৃতিতে কোথাও দুজনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলমাল গোছের মানুষ, তাঁর মাথা ভরা টাক, গোঁফ- দাড়ি সব কামানো। ছাপান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল। এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবে মাত্র পেন্‌সন্ নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যেঠামশাই, এ-ছাড়া ত্রিসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যেঠামশাই বিয়েটিয়ে করেননি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন।

রামপ্রসাদ সান্যাল লোকটি ছিপ্‌ছিপে লম্বা। পোস্টমাস্টার প্রাণশঙ্কর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে না। এক অক্ষর ইংরাজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারী কিনেছেন আর নানারকম কারখানায় অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার উপর একরাশ চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম-ছাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কেবল নাকের উপর স্প্রিং দিয়ে এঁটে বসানো। মোট কথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা-বিস্কুট-সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাশা গল্প-গুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের উপর প্রকাণ্ড ফরাশ পাতা, তার উপর কতকগুলো

মোটাসোটা তাকিয়া আর রঙচঙে হাত-পাখা এদিক-ওদিক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ার-টেবিল বা কোনরকম আসবাবপত্র একেবারেই নেই।

পোস্টমাস্টারবাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেক্টার বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড়ো লাজুক লোক, প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতেন না। সে-পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন, কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টমাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টমাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার একরকম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথমদিনের পরিচয়েই দুজনের আলাপ এমন জমে উঠল যে তারপর থেকে রামবাবুর বৈঠকে যাবার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোনো তাগিদ দেওয়ার দরকার হত না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে না পারার দরুন কত সময়ে কত অদ্ভুত ভুল হয়, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, "আমি একবার যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, সে বোধহয় আপনাদের বলিনি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রমথবাবু এসেছেন। প্রমথ মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাত। সেদিন কথা ছিল আমি তার জন্য একটা মিক্‌সচার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময় সেটা নিয়ে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম, ওষুধটা এখুনি একদাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনোরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ-কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তাহলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগ্‌গির সারবে। মিনিট খানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠিটা পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইয়ের শিশিটি ভেঙে আমায় গাল দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন। শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটা সন্ধ্যান করতেই বোঝা গেল যে, লোকটি মোটেই প্রমথ মিত্তির নন, আমারই মামাশ্বশুর বাঁশবেড়ের প্রমথ

নন্দী। যেরকম বদমেজাজী লোক, সে রাত্রেই আমায় ছুটতে হল বুড়োর তোয়াজ করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠাণ্ডা হয়! তাঁকে অপমান করা, বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করা যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিম্বা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয়নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রমথ মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি না পেয়ে খুব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

এই গল্প শুনে ইনস্পেক্টারবাবু বললেন, 'আপনার তো, মশাই, অল্পের উপর দিয়ে গেল, আমার ঐ রকম একটা ভুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহুদিনের কথা, তখন আমি সবেমাত্র পুলিশের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মণ্ডলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। একদিন খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিয়াল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনস্পেক্টার যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনস্টেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিক থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবধানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝাপসা আলোয় লাঠি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর এক পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলল, 'সুদাসদা, কতদূর এলাম?' উত্তর হল, 'এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে।' অম্নি আর কথা নেই। আমি জোরে শিস্ দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মার-মার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো 'বাপরে মারে' করে কে যে কোথায় সরে পড়ল, তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল, তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়েস অল্প, চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের—বুঝলাম এই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিল, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু, এখন রোখ করে লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে বলো।' শুনে তার সঙ্গের বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে খানিকক্ষণ অনর্গল কি যে বকে গেল তার কিছুই বুঝতে পারলাম না, খালি

বুঝলাম যে সে আমাকে তার 'সুদাসদা'র পরিচয় বোঝাচ্ছে। আমি বললাম, "অত পরিচয় শুনবার আমার দরকার নেই, আসল পরিচয়টা আজ ভালোরকমই পেয়েছি।" তারপর তাদের হাতকড়া পরিয়ে তো মহাফুর্তিতে থানা এনে হাজির করা গেল। তারপর মশাই যা কাণ্ড! হেড ইনস্পেক্টার যতীনবাবু রাগে আগুনের মতো লাল হয়ে, টেবিল থাবড়িয়ে, দোয়াত উলটিয়ে, কাগজ-কলম ছুঁড়ে আমায় খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন যে আমি একটি আস্ত রকমের হস্তীমূর্খ ও অবাচীন পাঁঠা। যে লোকটিকে ধরে এনেছি সে মোটেই সুদাস মণ্ডল নয়, তার নাম সুবাসচন্দ্র বোস; সে যতীনবাবুর জামাই, সঙ্গের লোকটি তার ঠাকুরদার আমলের চাকর; যতীনবাবুর কাছেই তারা আসছিল। আমার বুদ্ধিটা হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতো না হলে, আমি সুবাস শুনতে কখনই সুদাস শুনতাম না—ইত্যাদি। অনেক কষ্টে অনেক খোশামুদি করে, অনেক হাতে-পায়ে ধরে, সে যাত্রায় চাকরিটা বজায় রাখতে হয়েছিল।"

ইনস্পেক্টারের গল্প শেষ হতেই বৃন্দাবনচন্দ্র টিকি দুলিয়ে বললেন, "আপনাদের গল্প শুনে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেও ঐরকম 'উদোর-বোঝা-বুদোর-ঘাড়ে' গোছের গল্প। তবে ভুলটা আমি নিজে করিনি, করেছিল আমার ভাইপো—সেই যে ছোকরাটি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে বসে আছি। ঘরেও বাতি জ্বালা হয়নি, বাইরেও বেশ অন্ধকার, খালি নখের মতো একটুখানি চাঁদ সবেমাত্র পুবদিকে উঁকি দিয়েছে; এমন সময় মনে হল যেন একটা মানুষ দেয়াল বেয়ে বেয়ে বাড়ির ছাদের উপর উঠছে—"

বৃন্দাবনবাবু সবে এইটুকু বলেছেন, এমন সময় বারান্দায় কে ডাক দিল, "বাবু, টেলিগ্রাম।" রামবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আসলেন, তারপর চোখের চমশাটি কপালে তুলে টেলিগ্রামখানা খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ক্রমেই গোল হয়ে উঠছে দেখে ডাক্তারবাবু জিগ্‌গ্যেস করলেন, "কি ব্যাপারখানা কি?" রামবাবু ধপাস্ করে সোফার উপর বসে পড়ে বললেন, "এই দেখুন না, দেশ থেকে পরেশ টেলিগ্রাম করছে—সিরিয়াস্ একসিডেন্ট কাম্ ইমডিয়েটলি (অর্থাৎ গুরুতর দুর্ঘটনা, শীঘ্র আসুন)।" রামবাবুর তিন ছেলে কয়দিন হল পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছে, আর একটি মামাবাড়িতে আছে, আর বাকি তিনটে মায়ের কাছে বাড়িতেই রয়েছে। রামবাবু বললেন, "এত লোক থাকতে পরেশ

ছোকরাটাকে দিয়েইবা টেলিগ্রাম করাতে গেল কেন? দুটো পয়সা খরচ করে বড়রা কেউ একটু ভালো করে গুছিয়ে টেলিগ্রাম করলেই পারত। এখন কি যে করি? আজ বিষ্যুৎবার, এ-সময়ে রওয়ানাইবা হই কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" তিনি চাকরকে ডেকে তিনতলার বড় ঘর থেকে তাঁর কলমটা আনতে বললেন, আর বললেন, "একটা টেলিগ্রাম করে দেখা যাক কি জবাব আসে।" এই ব'লে তিনি আবার টেলিগ্রামখানা পড়তে লাগলেন।

গল্পগুজব তো চুলোয় গেল, সবাই মিলে ভাবতে বসল এখন কি করা যায়। এমন সময় রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "ও কি! এ কার টেলিগ্রাম? এ তো দেখছি 'রামপদ সেন' লেখা। আমার কি যে চোখ হয়েছে, আমি পড়ছি রামপ্রসাদ সান্যাল।" বলতেই পোস্টমাস্টার প্রিয়শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "ও! রামপদ যে ও-পাড়ার গুপীবাবুর ভাই; আমি জানি তার শ্বশুরের নাম পরেশনাথ কি যেন।" তখন খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল।

রামবাবু বললেন, "দেখলেন মশাই, পিয়ন ব্যাটার কাণ্ড! ভুল টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় মেরেছিল আর কি! একে বুড়ো বয়েস, তাতে আবার জানেন তো আমার হার্টের ব্যারাম আছে।" হেডমাস্টার যতীশবাবু হেসে বললেন, "আপনি আবার এর মধ্যেই বুড়ো হলেন কি করে?" রামবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ পাড়ায় আমার মতন বুড়ো আর ক'টি পান দেখুন তো! এই আষাঢ় মাসে আমি ষাটের কোঠায় পা দিয়েছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তাহলে আমার জ্যেঠামশায়ের কাছে আপনার হার মানতে হল। তাঁর ঊনসত্তর।" ডাক্তারবাবু বললেন, "আমারও বড় কম হয়নি, চৌষট্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ-পাড়ায় বয়েসের জন্য যদি প্রাইজ দিতে হয়, তাহলে ভোলানাথের বাপকেই দেওয়া উচিত; তার নাকি এখন আটাত্তর বছর চলেছে।" এই রকম বাজে কথা চলছে, এমন সময়ে বড় বড় বারকোশের উপর থালা সাজিয়ে রামবাবুর তিনটে চাকর খাবার নিয়ে হাজির। কচুরি, নিমকি, সন্দেশ থেকে পিঠে পায়েস পর্যন্ত প্রায় বারো-চৌদ্দ রকমের খাবার। ডাক্তার বললেন, "বাপারে! এ যে বিরাট আয়োজন। ব্যাপারখানা কি?" রামবাবু বললেন, "ঐ যা! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। আজ আমার জামাই এসেছেন, তাই বাড়িতে একটু মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়েছে।" ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "এত বড় গুরুতর কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন? আপনার বয়েসটা নিতান্তই বেড়ে গেছে দেখছি।" বৃন্দাবন বললেন, "তা

হোক, আজকের বৈঠকে অনেক রকমই ভুলের কাণ্ড শুনলাম আর দেখলাম, কিন্তু এ ভুলটি বেশিদূর গড়ায়নি। আসুন, এখন ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যাক।"

১. গোড়াতেই রামবাবুকে কৃপণ বলা হইয়াছে, কিন্তু গল্পে তাঁহার স্বভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা মোটেই কৃপণের মতো নয়।
২. বলা হইয়াছে রামবাবু ও বৃন্দাবনবাবুর মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা, অথচ পরেই বলা হইয়াছে কারো সঙ্গে বৃন্দাবনবাবুর আলাপ পরিচয় নাই।
৩. প্রথমেই বৃন্দাবনবাবুর মাথা-ভরা টাক বলা হইয়াছে, অথচ তিনি টিকি দুলাইতেছেন।
৪. প্রথমে বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স ৬০, কিন্তু তিনি চাকরি করিয়াছেন ৫৬ বৎসর।
৫. বলা হইয়াছে যে গিন্নী আর জ্যেঠামহাশয় ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, কিন্তু পরে তাঁহার এক ভাইপোকে হাজির করা হইয়াছে।
৬. প্রথমে পোস্টমাস্টারের নাম বলা হইয়াছে প্রাণশঙ্কর, পরে লেখা হইয়াছে প্রিয়শঙ্কর।
৭. রামবাবু ইংরাজী জানেন না, অথচ তিনি চট্‌পট্‌ ইংরাজী টেলিগ্রাম পড়িতেছেন।
৮. রামবাবু পাটের তেলের ব্যবসা করেন, কিন্তু এরকম কোনো তেল বা ব্যবসার কথা শোনা যায় না।
৯. ঐ লাইনে তাঁহার বাড়ি দোতলা হইয়াছে, কিন্তু চাকর গেল তিনতলায়।
১০. রামবাবুর আটটি ছেলে। কিন্তু মাত্র সাতটির হিসাব পাওয়া যাইতেছে।
১১. রামবাবুর মেয়ে নাই, কিন্তু তাহার এক জামাই আসিয়া হাজির।
১২. তাঁহার চশমার যে বর্ণনা হইয়াছে, সেইরূপ চশমা কপালে তোলা যায় না।
১৩. প্রথমে বলা হইয়াছে ঘরে কোনোরকম আসবাবপত্র নাই, কিন্তু পরে সোফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৪. বলা হইয়াছে, 'বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার' বৃন্দাবন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন; গল্পের ঘটনা তাহার 'সাত দিনের পরে' সুতরাং সেদিন বৃহস্পতিবার হইতেই পারে না।

১৫. বড়দিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পূজার ছুটি অসম্ভব।

১৬. বৃন্দাবনবাবুর বয়স মোটে ৬৯ হইতেই পারে না।

১৭. চাঁদকে যখন আমরা সূর্যের কাছাকাছি দেখি তখনই তাহার চেহারা থাকে 'সরু নখের মতো' সন্ধ্যার সময় পুবদিকে, অর্থাৎ সূর্যের উল্‌টা দিকে তাহার ওরকম চেহারা অসম্ভব।

গল্প

"বড়মামা, একটা গল্প বল না।"

"গল্প? এক ছিল গ, এক ছিল ল আর এক ছিল প—"

"না—ও গল্পটা না। ওটা বিচ্ছিরি গল্প—একটা বাঘের গল্প বল।"

"আচ্ছা। যেখানে মস্ত নদী থাকে আর তার ধারে প্রকাণ্ড জঙ্গল থাকে—সেইখানে একটা মস্ত বাঘ ছিল আর ছিল একটা শেয়াল।"

"না, শেয়াল তো বলতে বলিনি—বাঘের গল্প।"

"আচ্ছা, বাঘ ছিল, শেয়াল-টেয়াল কিছু ছিল না। একদিন সেই বাঘ করেছে কি একটা ছোট্ট সুন্দর হরিণের ছানার ঘাড়ে হাল্লুম ক'রে কাম্‌ড়ে ধরেছে—"

"না—সে রকম গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে না। একটা ভালো গল্প বল।"

"ভালো গল্প কোথায় পাব? আচ্ছা শোন—এক ছিল মোটা বাবু আর এক ছিল রোগা বাবু। মোটা বাবু কিনা মোটা, তাই তার নাম বিশ্বম্ভর, আর রোগা বাবু কিনা রোগা তাই নাম কানাই।"

"বিস্‌-কম্বল মানে কি মোটা, আর কানাই মানে রোগা?"

"না; মোটা কিনা, তাই তার মস্ত মোটা নাম—বিশ্‌-শম্‌-ভর্‌। আর রোগা লোকের নাম কানাই।"

"রোগা কানাই বলল, "মোটা বিশ্বম্ভর, তোমার এমন বিচ্ছিরি ঢাকাই জালার মতন চেহারা কেন?' মোটা বিশ্বম্ভর বলল, 'রোগা কানাই, তোর হাত পা কেন কাঠির মতন, হাড়গিল্লের ঠ্যাঙের মতন, রোদে-শুকনো দড়ির মতন?' তখন তারা ভয়ানক চটে গেল। রোগা বলল, 'মোট্‌কা লোকের বুদ্ধি মোটা। মোটা বলল, 'রোগা লোকের কিপটে মন।"

"মোটা বুদ্ধি মানে কি বোকা বুদ্ধি?"

"হ্যাঁ। তারপর শোন—মোটা আর রোগা তখন খুব ঝগড়া করতে লাগল। এ বলল, 'রোগা মানুষ ভালো নয়'— ও বলল, 'মোটা হলেই দুষ্টু হয়।' তখন তারা বলল, 'আচ্ছা চল তো পণ্ডিতের কাছে—বইতে কী লেখা আছে জিজ্ঞাসা কর তো।'

"বইয়েতে কি সব কথা লেখা থাকে?"

"হ্যাঁ, থাকে। তারা তখন দুজনেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করল। পণ্ডিতমশাই নাকের আগায় চশমা এঁটে, কানের ফাঁকে কলম গুঁজে, মুণ্ডু নেড়ে, টিকি ঝেড়ে তেড়ে বললেন, "রোসো! দাঁড়াও, একটু বসো—রোগা এবং মোটা এদের কে কি রকম পাজী, বিচার করব আজই।' এই বলে পণ্ডিতমশাই তাকিয়ার উপর পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। রোগা কানাই আর মোটা বিশ্বম্ভর বসেই আছে বসেই আছে—এক ঘণ্টা যায়, দু' ঘণ্টা যায়! তখন পণ্ডিতমশাই চোখ রগড়িয়ে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি?' বাবুরা বললেন, 'আজ্ঞে, সেই রোগা আর মোটার কথা।' পণ্ডিত বললেন, 'ঠিক ঠিক—এই বলে প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হেলেদুলে, ষাঁড়ের মতন সুরটি ক'রে তিনি বলতে লাগলেন—'বইয়ে আছে—

মোটকা মানুষ হোঁৎকা মুখ,
বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুক।

অমনি রোগা কানাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। তখন পণ্ডিত বললেন—

'শুক্‌নো লোকের শয়তানি
দেমাক দেখে হার মানি।'

তাই শুনে মোটাবাবু হেসে লুটোপুটি। তখন পণ্ডিত বললেন, 'বইয়ে লিখেছে—

মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙের মতো
নিষ্কর্মা সব হদ্দ কুঁড়ে
কুমড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে!

—আর—

চিম্‌সে রোগা যত ব্যাটা
বিষম ফাজিল বেদম জ্যাঠা
শুঁট্‌কো লোকের কারসাজী

হিংসুটে আর হাড় পাজী ॥

তাই শুনে রোগা মোটা দুয়ে মিলে ভয়ানক রকম চটে গেল।

পণ্ডিত বললেন—

'দুটোই বাঁদর দুটোই গাধা
রোগা মোটা সমান হাঁদা।
ভণ্ড বেড়াল পালের ধাড়ী
লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি
মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে
চুন কালি দাও দুটো মুখে ॥'

"এই বলে পণ্ডিতমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে, নাকে মুখে গুঁজে আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন।"

"তারপর সেই বাবুরা কী বললে?"

"বাবুরা হাঁ ক'রে বোকার মতো মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বাড়ি চলে গেল, আর ভাবল পণ্ডিতটা কী বোকা!"

দ্রিঘাংচু

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ একসঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতায় খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোর ক'রে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক বিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল! তখন রাজা মশাই বললেন, "ডাকো পণ্ডিতসভার যত

পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পণ্ডিতরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,—"আজ্ঞে, বোধ হয় তার ক্ষিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ক্ষিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী, ওকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোলতাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' ক'রে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বলল, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে; একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বললে, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঞ্চু কি হে?" লোকটা বলল, "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না,—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে?" লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি? ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী?" লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম, তাহলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন,

"মন্ত্রটা আমায় বল তো।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাট্‌কেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

এক বছরের রাজা

এক ছিলেন সওদাগর—তাঁর একটি সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশি হয়ে থাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক'রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, "সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।" ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙেচুরে জিনিসপত্র-লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড় বড় গাছের বন—তারপর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চীৎকার ক'রে বলল, "শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।" তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, 'মহারাজ', 'মহারাজ', হুকুম মাত্র সবাই চট্‌পট্‌ কাজ করছে, এসব দেখেশুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে, তাই এরকম মনে হচ্ছে।

কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, "এ কি রকম হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনইবা আমায় 'মহারাজ' বলছ আর কেনইবা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?"

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, "মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই—আমরা সকলেই প্রেতগন্ধর্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মতো। অনেক দিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম; কারণ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান আর কে আছে? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয়নি। প্রতি বৎসরে একটি ক'রে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসরের শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে ক'রে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটিও জল মেলে না। তারপর আবার নতুন রাজা আসে—এই রকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।"

তখন দাসরাজা বললেন, "আচ্ছা বল তো—এর আগে তোমাদের রাজারা কি রকম স্বভাবের লোক ছিলেন?" বুড়ো বলল, "তাঁরা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খামখেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছর শেষে কি হবে সে কথা ভাবতেন না।"

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে ক'দিন তাঁর ঘুম হল না!

তারপর দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, রাজা তাদের কাছে মিনতি ক'রে বললেন, "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছর শেষে এই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।"

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ যে, সে বলল, "মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে ফিরে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি যা ইচ্ছা হয়, তাই করাতে পারেন। আমি বলি—এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে, সেখানে বাড়ি ক'রে, বাগান ক'রে, চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারদিক সুন্দর ক'রে রাখুন।

ততদিনে ফুলে ফলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে-খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।" রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা, ফলের বীজ, আর বড় বড় কলকব্জা পাঠিয়ে, আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নাই—চারিদিকে ঘরবাড়ি, পথঘাট, পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফুর্তি ক'রে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভরে রাজত্ব করতে লাগলেন।

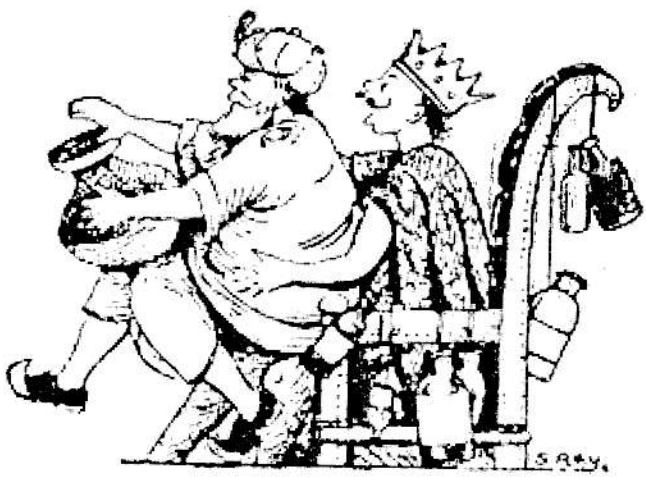

হিংসুটি

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে—বেজায় হিংসুটি, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকে, তারা তো আমার উপর চটে যাবে।

হিংসুটির দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজেকর্মে, তেমনি লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়েস সাত বছর হ'য়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হল না—আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়, সে এখনই "বোধোদয়" আর "ছেলেদের রামায়ণ" পড়ে ফেলেছে, ইংরেজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তো দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যেবার ছবির বই প্রাইজ পেলে আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁটটি বাঁকিয়ে বসে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে, মলাটটি ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু'বোনকেই আদর ক'রে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি রে, কী হ'ল? জিভে কামড় লাগল নাকি?" হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বল্ না!" তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দিদির ঐ রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়।" তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট ক'রে

ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা, নতুন কাপড় আস্‌লে তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি লাল জামা গায়ে, লাল জুতা পায়ে, টুক্‌টুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, "দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয়ই মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" তখন তার ভয়ানক রাগ হল। সে ভাবল, "আমি তো ছোট বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?" এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিট্‌মিটে চোখ, আর ফুটফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত- পা, আর টুক্‌টুকে জামা-কাপড়! যত ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক-মুখ হাত পা ভেঙে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, "তোর জন্য কি এনেছি দেখিসনি?" শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, "কই মামা? কী এনেছ দাও না।"

মামা বললেন, "মার কাছে দেখ্ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।" হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, "কোথায় রেখেছ মা?" মা বললেন, "আলমারিতে আছে।" শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল। সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরান—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?" মা বললেন, "হ্যাঁ, তুই দেখেছিস্ নাকি?"

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কী ক'রে কমবে।

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ভাই, ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?" সওদাগর বলল, "পারব না কেন?" তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলবার কী আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।" তখন মহাজন তার থলে ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্দুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্ খুস্ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে যে বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল—থলি ভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হয়—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, "কাজটি ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠাকানো উচিত হয়নি।" একথা সেকথার পর মহাজন বলল, "তাহলে বন্ধু আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—আমি থলিটা আর সরাইনি।" বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বলল, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসলে কেন?" বন্ধু বলল, "ভাই সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা!" সওদাগর বলল, "তাও কি হয়? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায়?" সওদাগর চেষ্টা করছে এরকম ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবুও সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বলল, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোন গোল হয়ে থাকবে। যাক যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বলল, "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও!" বিকালবেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বলল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি, ছেলেটার পোষাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল। সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বলল, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলতো বন্ধু!" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বলল, "কি পাগলের মতো বকছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়? মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বলল, "কি জানি ভাই! আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার যো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামখা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বলল, "আমি? মুখ্য-সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর!

ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হয়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে না আসতেই ল্যাজ-ট্যাজ্ গজিয়ে দস্তুরমতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভুতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয়, তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার ভ'রে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।" মহাজন বলল, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য, এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।" তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, "দেখ্ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে তোর থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"

গরুর বুদ্ধি

পণ্ডিত মশাই ভট্‌চার্যি বামুন, সাদাসিধে শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষ। বাড়িতে তাঁর সরষের তেলের দরকার পড়েছে, তাই তিনি কলুর বাড়ি গেছেন তেল কিনতে।

কলুর ঘরে মস্ত ঘানি, একটা গরু গম্ভীর হয়ে সেই ঘানি ঠেলছে, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। গরুটা চলছে চলছে আর ঘানিটা ঘুরছে, আর সরষে পিষে তা থেকে তেল বেরুচ্ছে। আর গলার ঘণ্টাটা টুংটাং টুংটাং ক'রে বাজছে।

পণ্ডিত মশাই রোজই আসেন, রোজই দেখেন, কিন্তু আজ তাঁর হঠাৎ ভারি আশ্চর্য বোধ হল। তিনি চোখ-মুখ গোল ক'রে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাই তো এটা তো ভারি চমৎকার ব্যাপার!

কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে কলুর পো, ও জিনিসটা কি হে?" কলু বলল, "আজ্ঞে ওটা ঘানিগাছ, ওতে তেল হয়।" পণ্ডিত মশাই ভাবলেন—এটা কি রকম হল? আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম হয়, আর ঘানি গাছের বেলায় তেল হয় মানে কি? কলুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঘানি ফল হয় না?" কলু বলল, "সে আবার কি?"

পণ্ডিত মশাই টিকিতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগলেন, তাঁর প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু কোথায় যে ভুল হয়েছে, সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তাই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তারপর বললেন, "তেল কী ক'রে হয়?" কলু বলল, "ঐখানে সর্ষে দেয় আর গরুতে ঘানি ঠেলে—আর ঘানির চাপে তেল বেরোয়।" এইবারে পণ্ডিত মশাই খুব খুশি হ'য়ে ঘাড় নেড়ে টিকি দুলিয়ে বললেন, "ও বুঝেছি! তৈল নিষ্পেষণ যন্ত্র!"

তারপর কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে পণ্ডিতমশাই বাড়ি ফিরতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে আর একটা খট্‌কা লাগল—"গরুর গলায় ঘণ্টা

কেন?" তিনি বললেন, "ও কলুর পো, সবি তো বুঝলাম, কিন্তু গরুর গলায় ঘণ্টা দেবার অর্থ কী? ওতে কি তেল ঝাড়াবার সুবিধা হয়?" কলু বলল, "সব সময় তো আর গরুটার উপরে চোখ রাখতে পারি নে, তাই ঘণ্টাটা বেঁধে রেখেছি। ওটা যতক্ষণ বাজে, ততক্ষণ বুঝতে পারি যে গরুটা চলছে। থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ বন্ধ হয়, আমিও টের পেয়ে তাড়া লাগাই।"

পণ্ডিত মশাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখেননি; তিনি বাড়ি যাচ্ছেন আর কেবলই ভাবছেন—'কলুটার কি আশ্চর্য বুদ্ধি! কি কৌশলটাই খেলিয়েছে! গরুটার আর ফাঁকি দেবার যো নেই। একটু থেমেছে কি ঘণ্টা বন্ধ হয়েছে, আর কলুর পো তেড়ে উঠেছে!' এই রকম ভাবতে ভাবতে তিনি প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল—আচ্ছা, গরুটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে তাহলেও ত ঘণ্টা বাজবে, তখন কলুর পো টের পাবে কী ক'রে?

ভট্টচার্যি মশায়ের ভারি ভাবনা হল। গরুটা যদি শয়তানি ক'রে ফাঁকি দেয়, তা হলে কলুর ত লোকসান হয়। এই ভেবে তিনি আবার কলুর কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হে, ঐ যে ঘণ্টার কথাটা বললে, ওটার মধ্যে মস্ত গলদ থেকে গেছে। গরুটা যদি ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা বাজায়, তাহলে কী করবে?" কলু বিরক্ত হয়ে বলল, "ফাঁকি দিয়ে আবার ঘণ্টা বাজবে কি রকম?" পণ্ডিত মশাই বললেন, "মনে কর যদি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, তা হলেও ত ঘণ্টা বাজবে, কিন্তু ঘানি ত চলবে না। তখন কী করবে?" কলু তখন তেল মাপছিল, সে তেলের পালাটা নামিয়ে পণ্ডিত মশায়ের দিকে ফিরে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার গরু কি ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছে, যে তার অত বুদ্ধি হবে? সে আপনার টোলে যায়নি, শাস্ত্রও পড়েনি, আর গরুর মাথায় অত মতলব খেলে না।"

পণ্ডিত মশাই ভাবলেন, 'তাও তো বটে। মূর্খ গরুটা ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, তাই কলুর কাছে জব্দ আছে।'

ছাতার মালিক

তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, বনের ধারে ব্যাং-ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠেনি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে সেই আদ্যিকালের ব্যাঙের ছাতা। সে যে কোথাকার কোন ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে, "ব্যাঙের ছাতা।"

যত সব দুষ্টু ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমুতে চায় না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গালফোলা কোলা ব্যাং, পালতোলা রাঙা ছাতা
মেঠো ব্যাং, গেছো ব্যাং, ছেঁড়া ছাতা, ভাঙা ছাতা।
সবুজ রং জবড়জং জরির ছাতা সোনা ব্যাং
টোক্কা-আঁটা ফোক্‌লা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোনা ব্যাং ॥
—কত ব্যাঙের ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাঙ-কে তারা চোখেও দেখেনি। সেখানে, মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ পাগ্‌লা ফড়িং থেকে থেকে তুড়ুক ক'রে মাথা ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে যায়: সেখানে, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হয়ে ওড়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে গাছে গাছে কাঠবেড়ালি সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে, গাছ বেয়ে ওঠে আর গাছ বেয়ে নামে, আর রোদে ব'সে গোঁফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু তারাও কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ি, দিদিমা আর ঠাকুরমা, তাঁরা বলেন, আজও সে ব্যাং মরেনি, তার ছাতার কথা ভোলেনি। যখন ভরা বর্ষার বাদল নামে, বন-বাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাং তখন আপন ছাতার তলায় ব'সে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাং

এসে তার ছাতার ছাওয়ায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তান জুড়ে দেয়, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ এখন দ্যাখ।"

কিন্তু যেদিন সব দুষ্টু ছেলে জটলা ক'রে বাদলায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারা ত কেউ ব্যাং দেখেনি! আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা ক'রে বনের ধারে কান পেতেছে, সেবারে ত কই গান শোনেনি!

কিন্তু ছাতা যখন আছে, ব্যাং তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাং ফিরে আসবেই আসবে,—আর বলবে, "আমার ছাতা কই?" তখন তারা বলবে, "এই যে তোমার আদ্যিকালের নতুন ছাতা—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙিনি, ছিঁড়িনি, নষ্ট করিনি, নোংরা করিনি, খালি ওর ছায়ায় ব'সে গল্প করেছি।"—কিন্তু ব্যাংও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়, এমনি ক'রেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, "ব্যাং এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাং এসেছে!"

কোথায় ব্যাং? কে দেখেছে? বনের ধারে ছাতার তলায়; লালু দেখেছে, কালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কী করছে ব্যাং? কী রকম ব্যাং? লালু বললে, "পাট্‌কিলে লাল ব্যাং—যেন হলুদগোলা চুন। এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

কালু বললে, "ছাইয়ের মতন ফ্যাকসা রং, এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" চাঁদা বললে, "চকচকে সবুজ, যেন নতুন কচি ঘাস—এক চোখ বোজা এক চোখ খোলা।" ভোঁদা বললে, "ভুসো-ভুসো রং, যেন পুরোনো তেঁতুল-তেঁতুল— এক চোখ বোজা এক চোখ খোলা।"

গ্রামের যত বুড়ো যত মহা-মহা পণ্ডিত, সবাই বললে, "কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কী দেখেছিস আবার বল।" লালু কালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে, "ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাং, তার চার হাত লম্বা ল্যাজ!" শুনে সবাই মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু! তাহ'লে কক্ষণো সেটা ব্যাং নয়, সেটা বোধহয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?"

ব্যাং না হোক, ব্যাঙের ছেলে তো বটে—ছেলে না হোক নাতি, কিম্বা ভাইপো, কিম্বা ব্যাঙের কেউ তো বটে। সবাই বললে, "চল্ চল্ দেখবি চল্, দেখবি চল্।" সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় ব'সে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রংটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের

উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, "তুমি কে হে? কস্ত্বম্? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ? শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রং বদলিয়ে খোলা চোখটা বুজলে আর বোজা চোখটা খুললে, আর চিড়িক্ করে এক হাত লম্বা জিভ বার ক'রেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোম্‌রা বুড়ো, সে বললে, "মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালা না কি?" মোড়ল বললে, "হবেওবা।" সর্দার খুড়ো সাহস ক'রে বললে, "চল্ না ভাই এগিয়ে যাই, কানের কাছে চেঁচিয়ে বলি।" মোড়ল বললে, "ঠিক্ বলেছ।"

হোম্‌রা বললে, "তোমরা এগোও। আমি এই আঁকশি নিয়ে ঐ ঝোঁপের মধ্যে উঁচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাঁচাৎ ক'রে কুপিয়ে দেব।"

তখন সর্দার সেই ছাতার উপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কানের কাছে হঠাৎ "কোন্ হা—া—য়্" ব'লে এমনি জোরে হাঁকরে উঠল যে, সেটা আরেকটু হলেই ছাতার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, দু'চোখ তাকিয়ে বললে, "উঃ? অত চেঁচান কেন মশাই? আমি কি কালা?" তখন সর্দার নরম হ'য়ে বললে, "তুমি কি ব্যাঙের কেউ হও না?" জন্তু তখন "না-না-না-না—কেউ না—কেউ না—কেউ না" ব'লে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম দুলতে লাগল।

তাই না দেখে সর্দার বুড়ো চিৎকার ক'রে বললে, "তবে যে তুমি ছাতা নিতে এয়েছ?" সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগল, "নেমে এসো, নেমে এসো,—শিগ্‌গির নেমে এসো।" মোড়লখুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। আর হোম্‌রা বুড়ো ঝোপের মধ্যে থেকে আঁক্‌শিটা উঁচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, "কি আপদ। মশাই, ল্যাজ ধ'রে টানেন কেন? ছিঁড়ে যাবে যে?" সর্দার বললে, "তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?" জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল গোল চোখ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললে, "কি বললেন? কিসের কী?" সর্দার বললে, "বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।"

যেম্‌নি বলা, অম্‌নি সে খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে, একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মতো অদ্ভুত রং খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ে এল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?" কেউ বললে, "জল

দাও," কেউ বললে, "বাতাস কর।" অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠে বললে, "ব্যাঙের ছাতা কি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছা'তা হ'ল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতা নয়, "ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।" শুনে কেউ কোনো কথা বলতে পারলে না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

শেষকালে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কে মশাই?" ল্যাজওয়ালা বললে, "আমি বহুরূপী—আমি গিরগটির খুড়তুতো ভাই, গোসাপের জ্ঞাতি। এটা এখন আমার হ'ল—আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই ব'লে সে "ব্যাঙের ছাতা" টাকে বগলদাবা করে নিয়ে, গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

অসিলক্ষণ পণ্ডিত

রাজার সভায় মোটা মোটা মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দু'চারজন খেটেখুটে কাজ করে আর বাকি সবাই ব'সে ব'সে মাইনে খায়।

যারা ফাঁকি দিয়ে রোজগার করে, তারে মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষ-গুণ) বিচার করতে জানেন। অমনি রাজা বললেন, "উত্তম কথা, আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার, আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।"

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হয়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন, "এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।" ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে-ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চট্‌পট্‌ তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি সহজ। তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন। তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোনটা কার তলোয়ার। পণ্ডিত মশায় শুঁকবার সময় সেই মার্কটুকু দেখে নেন। যাদের উপর তিনি খুব খুশি থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা-টয়সা দেয়, আর খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, "খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের তলোয়ার" আর যাদের উপর তিনি চটা, তাঁকে ঘুষ দেয় না খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালোই হোক না কেন, তাঁর কাছে পার পাবার যো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অম্‌নি একটু শুঁকেই নাক সিঁট্‌কিয়ে ব'লে ওঠেন, "অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার তো নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!"

এমনি ক'রে কত ভালো ভালো কারিকর, কত চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার দু'টাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারা মনপ্রাণ দিয়ে এক একখানি তলোয়ার গড়ে, আর বিচারক মশাই "দূর! দূর!" ক'রে সব বাতিল করে দেন। এই রকম হতে হতে শেষটা কারিকর গেল ক্ষেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ ক'রে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত তাচ্ছিল্য ক'রে, "আবার কী গড়ে আন্‌লি? দেখি?" ব'লে, যেম্‌নি তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অমনি লঙ্কার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ-চ্‌-চো ক'রে এক বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘাঁচ্‌ ক'রে নাক কেটে দু'খান!

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল, "জল আন্‌রে," "কবিরাজ ডাক্‌রে,"— ততক্ষণে তলোয়ারওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ি পর্যন্ত পিঠ্‌টান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুশকিল। একে তো কাটা নাকে যন্ত্রণা, তার উপর সভায় বেরুলে সবাই ক্ষ্যাপায় "নাক-কাটা পণ্ডিত" বলে। বেচারার এখন মুখ দেখানোই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তঁলোঁয়াঁরটাঁ কেঁমন ছিঁলঁ!"

ব্যাঙের রাজা

রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাং, কোলাব্যাং, মেঠোব্যাং—সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে। ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাং, সে থাকে দেয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—দেখ্ দেখ্ দেখ্—ব্যাং ব্যাং ব্যাং—ব্যাঙাচি।' এই বলে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আর ব্যাংগুলো সব "যাই যাই যাই—থাক্ থাক্ থাক্" ব'লে, ঘুম ভেঙে, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুরপারের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাং ফুর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে—আর পড়বি তো পড়, এক্কেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে! রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাই-শান্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলেছে। মোটা মোটা সব নাগ্‌রাই জুতো খট্‌মট্ ঘ্যাচ্‌ম্যাচ ক'রে ব্যাং বুড়োর মাথার উপর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে এমনি রোখ ক'রে চলতে লেগেছে যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায় যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে যে সে বেচারা ঠিক্‌রে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের উপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাং বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙেনি, পাও ভাঙেনি, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল।—আর চারদিকে তাকিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার ক'রে সে চেয়ে দেখল, মাথায়-মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো-ঝল্‌মল্ চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছেন। লোকেরা সব

"রাজা, রাজা" ব'লে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় ব'সে খুশি হয়ে এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগল, সেও দু'হাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা!" তার মনে হল রাজামশাই ঠিক তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললেন! ব্যাং তখন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, "আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!"

তারপর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে খুঁজে ব্যাং যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো, সর্দার বুড়ো, সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বলল—"চোপ্ চোপ্ চোপ্ রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সব একসঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" বলে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দু'চোখ বুজে, দু'হাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধবধবে সাদা আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—'রাজা রাজা রাজা রাজা।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, "আহা! আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!" তাদের যে রাজা নেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাং বলল, "ভাই সকল, এস আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।" তখন সবাই মিলে গোল হলে ব'সে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, নানান্ সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা চাই, রাজা চাই, রাজা চাই—রাজা চাই, রাজা চাই।"

ব্যাং পুকরের ব্যাং দেবতা—যিনি বাদ্‌লা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝ্‌রি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন—তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃষ্টিও নেই, বাদ্‌লাও নেই, মেঘের কোনো চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?" ব্যাঙের বলল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।" দেবতা বললেন, "এই নে রাজা।" ব'লে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙের ফুর্তি

আর ধরে না। তারা গোল হয়ে ঘিরে ব'সে মনের সুখে গাইতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—"

এমনি ক'রে দু'দিন যায়, দশদিন যায়, শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নী বললেন, "ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে সে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না—ছাই রাজা!" তাই শুনে সবাই বলল, "ছাই রাজা! ছাই রাজা!—নড়েও না চড়েও না, দেখে না শোনেও না—ছাই রাজা!" তখন আবার বুড়ো ব্যাং গাছের উপর চড়ে বলল, "ভাই সকল, এস আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।" আবার সবাই গোল হয়ে ব'সে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান্ সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।" তাই শুনে ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, "ব্যাপারখানা কী? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আবার নতুন কী হল?" ব্যাঙেরা বলল, "ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না, চাই না, চাই না, চাই না, চাই না, চাই না—" ব্যাং দেবতা বললেন, "থাম্ তোরা থাম্—নতুন রাজা দিচ্ছি।" এই ব'লে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নে তোদের নতুন রাজা।"

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বাপ্‌রে বাপ্! কি প্রকাণ্ড রাজা!" চকচকে ঝক্‌ঝকে ধব্‌ধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা।" বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তাই সে কিছু বলল না; খালি চোখ মিট্ মিট্ ক'রে একবার এদিকে তাকাল, একবার ওদিকে তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হল, সন্ধ্যা হল—তারপর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলায় উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বকরাজা এসে একটা গোব্‌দামতন মোটা ব্যাঙে টপাস্ ক'রে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে ব্যাঙেরা হঠাৎ কেমন মুষ্‌ড়ে গেল—তাদের 'রাজা রাজা'র গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাংটিকে দিয়ে জলযোগ ক'রে একটি ঠ্যাং মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি ক'রে এক-এক বেলায় এক-একটি ক'রে ব্যাং বকরাজার পেটের মধ্যে যায়। ব্যাং-মহলে হৈচৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় ব'সে যুক্তি ক'রে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা?" কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নী বললেন, "তার জন্য ভাবছিস কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ্ না, আমিই গিয়ে ব'লে আসছি।"

সর্দার গিন্নী বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে হাত-মুখ নেড়ে কড়্কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, "ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক্ঝকে রঙ ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়,—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা'না, পোকা মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাম রাম রাম রাম—অমন আর কক্ষণো করিসনে।" বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুসনুদুস্ ব্যাং, তার নরম নরম গোলগাল চেহারা! টপ্ ক'রে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ ক'রে সর্দার গিন্নী তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন!

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্পট্ সরে ব'সে বড় বড় হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "পাজি রাজা! লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!" তাই শুনে সবাই একস্ঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, "পাজি রাজা! দুষ্টু রাজা! চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না, রাজা চাই না।"

ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, "দূর ছাই! আবার কী হল?" ব্যাঙেরা বলল, "বাপ্রে বাপ্! বাপ্রে বাপ! কী দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাং দেবতা হুশ্ ক'রে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল, "গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কক্ষণো চাইব না।"

ডাকাত নাকি?

হারুবাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূর, বেলা শেষ হয়ে এসেছে। হারুবাবু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছেন। তাঁর এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে ছাতা।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি কে যেন ঠিক তাঁরই মতন হনহনিয়ে তাঁর পিছন পিছন আসছে। হারুবাবুর মনে কেমন ভয় হল—চোর-ডাকাত নয়তো! ওরে বাবা! সামনের ঐ মাঠটা পার হবার সময় একলা পেয়ে হঠাৎ যদি ঘাড়ের উপর দু'চার ঘা লাঠি কষিয়ে দেয়, তাহলেই ত গেছি! হারুবাবুর রোগা-রোগা পা দু'টো কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে লাগল। কিন্তু লোকটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।

তখন হারুবাবু ভাবলেন, সোজা মাঠের উপর দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বড় রাস্তা দিয়ে বদ্যিপাড়া ঘুরেই যাওয়া যাক, না হয় একটু হাঁটাই হল। তিনি ফস্ ক'রে ডান দিকের একটা গলির ভিতর ঢুকেই বক্সীদের বেড়া টপকিয়ে একদৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ওমা! সেই লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি ঠিক তেমনি ক'রে বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির!

হারুবাবু ছাতাটাকে বেশ শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলেন—ভাবলেন, যা থাকে কপালে, কাছে আসলেই দু'চার ঘা কষিয়ে দেব। হারুবাবুর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি 'জিম্‌নাস্টিক্ করতেন—দু'তিনবার তিনি হাতের 'মাস্‌ল্' ফুলিয়ে দেখলেন, এখন শক্ত হয় কিনা।

আর একটু সামনেই কালিবাড়ি। হারুবাবু তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঝোপজঙ্গল ভেঙে প্রাণপণ ছুটতে লাগলেন। পিছনে পায়ের শব্দ

শুনে বুঝতে পারলেন যে, লোকটাও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছে! এ কিন্তু ডাকাত না হয়ে যেতেই পারে না! হারুবাবুর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, সামনে ঘাটের পাশে বসে কারা যেন গল্প করছে।

শুনবামাত্র হারুবাবুর মনে সাহস হল। তিনি ধাঁ ক'রে ছাতা বাগিয়ে সিংহবিক্রমে ফিরে বললে, "তবে রে! আমি টের পাইনি বুঝি? ভালো চাস ত—" কিন্তু লোকটির চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার তেজ থেমে গেল। অত্যন্ত নিরীহ রোগা ভালোমানুষ গোছের লোকটি—ডাকাতের মতো একেবারেই নয়!

হারুবাবু তখন একটু নরম মতো ধমক দিয়ে বললেন—"খামখা আমার পেছন পেছন ঘুরছ কেন হে?" লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আর থতমত খেয়ে বলল, "স্টেশনের বাবুটি যে বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতেই থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমতো পৌঁছব।—তা আপনি কি বরাবর এইরকম ক'রে বেঁকেচুরে চলেন নাকি?" হারুবাবু ঠিক এক মিনিট হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকেও বলবার মতো কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কাজেই ঘাড় হেঁট ক'রে আবার সোজা পথে বাড়ি ফিরে চললেন।

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

সপ্তম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়